কেমন করে আবিষ্কার হলো

সুনীল সরকার

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা – ৯

প্রকাশক :
সুবিমল বিশ্বাস
৭০, মহেন্দ্রচন্দ্র গার্ডেন রোড,
কলিকাতা-৩০

দ্বিতীয় প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭০

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

কেমন করে আবিষ্কার হলো

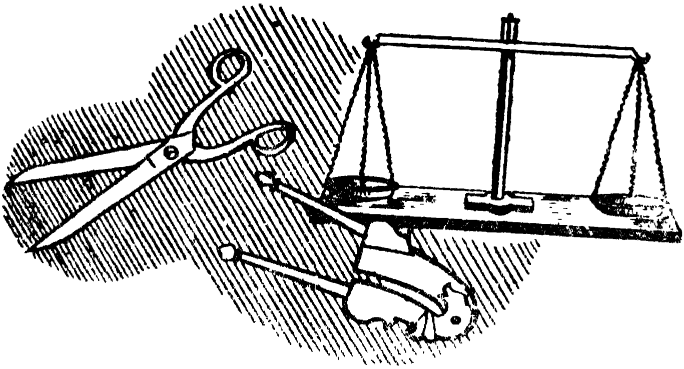
॥ যন্ত্র ॥

পৃথিবীর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেষ্টা হলো—ভালো খাবার প্রস্তুত করা, ভালো পোষাক তৈরী, ভালো বাসস্থান নির্মাণ করা ও জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করা। এই সকল কাজ করতে হলে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। সুতরাং কাজ করতে বেশ কষ্ট হয় এবং মানুষ ক্লান্তি বোধ করে। এই শারীরিক কষ্টের লাঘব করার জন্য ও কাজকে সহজ করার জন্য মানুষ ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কার করতে শিখলো। এই কৌশলকে বিশেষ উপায়ে রূপদান করাকেই বলা হয় 'যন্ত্র'।

যেমন, তীর-ধনুকের ব্যবহার প্রাচীনকালের মানুষও জানতো। চাকা একটা বড় আবিষ্কার। প্রাচীনকাল থেকে এর ব্যবহার চলে আসছে। খুব ভারী একটা জিনিষ রয়েছে—তাকে সোজাসুজি উঁচুতে তোলা দুঃসাধ্য। একখানা তক্তা কাত করে রেখে তার উপর দিয়ে জিনিষটা তোলার কায়দাও আগেকার মানুষ জানতো। জানতো সে যুগের মানুষ এই আনত-তলের অসুবিধার কথাও।

লিভারের ব্যবহারও বহু পুরান। দাঁড়িপাল্লা লিভারের অতি পরিচিত উদাহরণ। আর এটাও সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। এছাড়া মাটিকাটার কোদাল, কয়লা তোলবার বেলচা, ঢেঁকি, হাত-পাম্পের হাতল, কাঁচি, সাঁড়াশী ও জাঁতি ইত্যাদি লিভার-যুক্ত যন্ত্রগুলি সেকালেই যে তৈরী হয়েছিলো তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। শোনা যায়, বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস বলেছিলেন, একটা

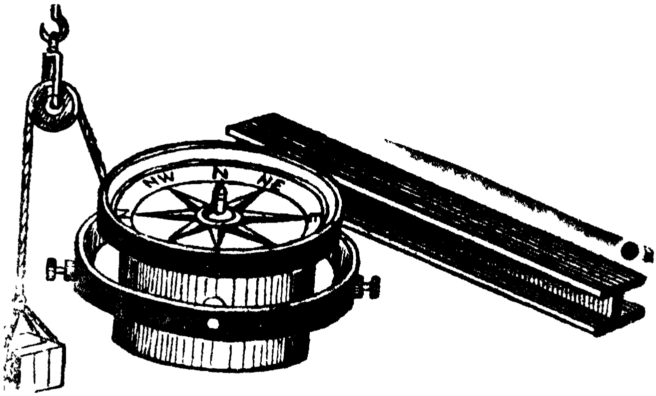
লিভারকে যদি অনেক বড় করতে পারা যায় তাহলে এমন কোন ভারি জিনিস নেই—যা ওই লিভার দিয়ে তুলতে পারা যায় না। রাজাকে তিনি বলেছিলেন : আমাকে দাঁড়াবার একটা জায়গা দিন, আমি সমস্ত পৃথিবীটাকে তুলতে পারবো। অবশ্য আর্কিমিডিস জানতেন, লিভারের ডাণ্ডাটা পৃথিবীর ভার সইতে



পারার মত শক্ত হওয়া চাই। আর পৃথিবীর বাইরে যেখানে তিনি দাঁড়াবেন তাঁকে সম্পূর্ণ নিশ্চল হতে হবে। কিন্তু এ দুটোর কোনটিই সম্ভব নয়!

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগের কথা। গ্রীস দেশের আইরাকিউস রাজ্যের রাজা ছিলেন তখন হায়রো। আর এই দেশে জন্মেছিলেন সে যুগের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস। রাজা হায়রো ছিলেন আর্কিমিডিসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শোনা যায়, একবার রাজা হায়রো বন্ধু আর্কিমিডিসকে মানুষের উপকারে লাগে এমন সব যন্ত্র তৈরী করতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর কথাটা আর্কিমিডিসের মনে ধরে তাই তিনি নিত্য নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের কাজে মন দেন। আর তারই ফলে আবিষ্কৃত হয় পুলি বা কপিকল, কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র, স্ক্রু ও যুদ্ধের সময় ব্যবহারের উপযোগী নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র। এছাড়া কড়ি, বরগা ইত্যাদিও তিনি তৈরী করেন।

ইতিহাস বলে, বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিউনার্দো দ্য ভিঞ্চি আজ থেকে বহু বহু বছর আগেই মানুষের উপকারে আসে এমন সব অভিনব যন্ত্রের নকশা এঁকে রেখেছিলেন—এমনকি আধুনিক



যান্ত্রিক যুগের দ্রুততম সব যানের নিখুঁত নকশাও নাকি তাঁরই আঁকা। এখন সেই যান্ত্রিক যানে চড়েই মানুষ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে যাতায়াত করছে

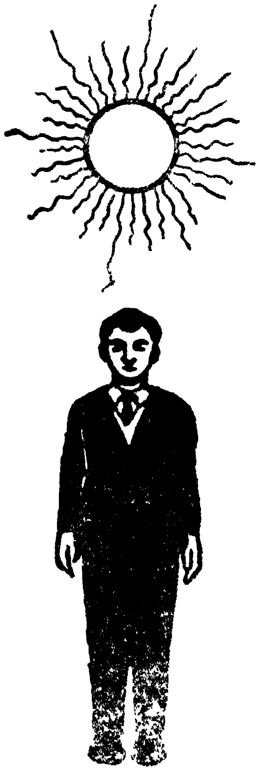
॥ মাপজোখ ॥

একজন বিজ্ঞানী বলেছিলেন, তুমি যে জিনিসের কথা বলছো, তা যদি মাপতে পারো—সংখ্যা দিয়ে তা প্রকাশ করতে পারো তবে জানা যাবে যে সে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে। কিন্তু তা যদি না পারো তবে বোঝা যাবে সে সম্বন্ধে জ্ঞান তোমার খুবই ভাসা ভাসা।

তুমি যদি বলো লোহাটা ভারি, দিল্লী অনেক দূর বা দিল্লী মেল খুব জোরে যায়—এসব কথার কোন মানে হয় না। তোমাকে বলতে হবে, লোহাটার ওজন এত কেজি বা পাউণ্ড, রেলপথে

মাপের একটা 'প্লাটিনাম দণ্ড' ঠিক করা হলো। আজো সেটা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

আর সময়ের মাপকাঠি ঠিক করার জন্য বিজ্ঞানীরা এমন ঘটনা ধরলেন যা নির্দিষ্ট অন্তর অন্তর ঘটে চলেছে। তোমরা জানো, পৃথিবী পুরো একটা পাক খাচ্ছে নির্দিষ্টকাল অন্তর অন্তর। সেইটিকে ধরে সময়ের মাপকাঠি ঠিক করলেন বিজ্ঞানীরা। সূর্য ঠিক মাথার উপর যখন এলো, আর তার পরদিন যখন আবার মাথার উপর এলো, এই কালটাকে ২৪ ভাগে ভাগ করে যেটা হলো, সেটাকে বললেন ঘণ্টা। তার ৬০ ভাগের ১ ভাগ হলো মিনিট। আর তার ৬০ ভাগের এক ভাগ হলো সেকেণ্ড। আর এই সেকেণ্ডই হলো বিজ্ঞানের সময়ের একক বা মাপকাঠি।



দৈর্ঘ্য, ওজন ও সময় মাপবার আর একরকম পদ্ধতির প্রচলন করলেন বিজ্ঞানীরা—যাকে এখন আমরা বলি 'মেট্রিক পদ্ধতি'। এই মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য মাপার একক হলো 'মিটার'। এর এক মিটার সমান প্রায় ৩৯·৩৭ ইঞ্চি।

এমনি করেই সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মাপজোখ আবিষ্কার করে একদিন সমস্ত পৃথিবীকে একসূত্রে বাঁধলো।

॥ অতসী কাঁচ ॥

সে অনেককাল আগের কথা। সিসিলি প্রদেশে সাইরাকিউস নামে এক রাজ্য ছিলো। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন হায়রো। একবার রাজা হায়রো খবর পেলেন রোমানরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করার জন্যে সমুদ্র পথে দ্রুত এগিয়ে আসছে।



আর্কিমিডিস

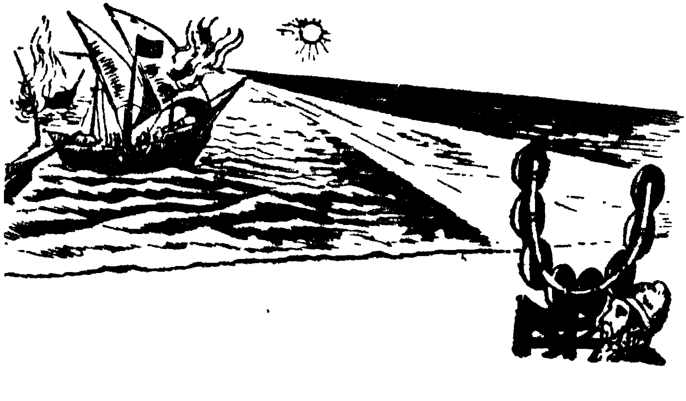
রাজা মহাভাবনায় পড়লেন। কি করা যায়? কেমন করে রাজ্য রক্ষা করা যায়। কেননা, তাঁর নেই অস্ত্রবল—নেই সৈন্য বল। কাজেই কেমন করে তিনি ওই বিরাট শক্তিকে পরাজিত করবেন। মুষড়ে পড়লেন হায়রো। তবে কি শেষ পর্যন্ত দেশকে রক্ষা করা যাবে না। পারবেন না দেশবাসীকে বাঁচাতে? তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অস্থির হয়ে উঠলেন। অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেলো বন্ধু আর্কিমিডিসের কথা।

তিনি তক্ষুনি ডেকে পাঠালেন সে যুগের প্রখ্যাত-গণিতবিদ, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত আর্কিমিডিসকে। আর্কিমিডিসও রাজার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন রাজদরবারে।

রাজা হায়রো বিচলিত হয়ে বললেন ঃ বন্ধু আর্কিমিডিস, খবর পেলাম রোমানরা আমাদের দেশ আক্রমণ করতে আসছে। রোমের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের নেই। অথচ দেশকে রক্ষা করতে হবে। বাঁচাতে হবে দেশবাসীকে। কাজেই আপনার সাহায্য আমার বিশেষ প্রয়োজন—প্রয়োজন আপনার পরামর্শ।

আর্কিমিডিস রাজার কথা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কি যেন ভাবলেন! তারপর রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ আপনি ঘাবড়ে পড়বেন না। দেখছি কি করা যায়। বলে তিনি চলে গেলেন তার গবেষণাগারে।

এসেই সুরু করলেন গবেষণা। মারণাস্ত্র আবিষ্কারের গবেষণা। দিন রাত্রি একান্ত পরিশ্রম করে সত্যি সত্যি তিনি রোমীয় যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করার মত একটি মারণাস্ত্র আবিষ্কার করলেন। তিনি তার নাম দিলেন অতসী কাঁচ।



শোনা যায়, আর্কিমিডিস বিরাট বিরাট অতসী কাঁচের পাত তৈরী করে সমুদ্রের ধারে তা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সাজিয়ে নিজে

তাঁর পিছনে লুকিয়েছিলেন। তার পর সেই কাঁচে সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে রোমান যুদ্ধজাহাজের পালে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আর্কিমিডিস রাজা হায়রো এবং দেশবাসীকে সে যাত্রা রক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে পুনরায় যখন রোমান সৈন্যরা স্থলপথে এসে সাইরাকিউস আক্রমণ করলো তখন তিনি তা জানতে পারলেন না।



কেন না তখন তিনি মাটিতে বালি বিছিয়ে জ্যামিতির ক্ষেত্র এঁকে চলেছেন—কোনদিকে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ একদল সৈন্য এসে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করলো। হত্যা করলো তাঁকে চিনতে না পেরে। কারণ রোমান সেনাপতি মার্সেলাসের আদেশ ছিলো—বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসকে না মেরে সসম্মানে যেন ধরে নিয়ে আসা হয়।

কিন্তু একটু ভুলের জন্যই একটি মহাজীবনের সমাধি ঘটেছিলো—ইতিহাস আজও তারই সাক্ষী।

॥ দোলক ঘড়ি ॥

সে আজ প্রায় তিনশো বছর আগের কথা। ইটালীর পিসা সহরের গির্জার ভিতরে উপর থেকে লোহার শিকল দিয়ে একটা আলো ঝুলানো ছিলো। এক একবার দমকা হওয়া আসে আর আলোটা দুলতে থাকে। তারপর হাওয়া যেই বন্ধ হয় অমনি দোলনের বিস্তার ; অর্থাৎ আলোটা যতটা দূর দূব দোলে, ক্রমশ ছোট হয়ে আসে—শেষ অবধি দোলন থেমে যায়।

একটি বালক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখলো। হাজার হাজার লোক ওই আলোটাকে ওইরকমভাবে এর আগেও দুলতে দেখেছে. কিন্তু কারো মনে ওই আলোর দোলা সম্পর্কে



গ্যালিলিও

কোন কৌতূহল জাগেনি। কিন্তু ওই বালকের জানবার কৌতূহল হলো, আলোটা একদিক থেকে অন্যদিকে দুলতে কতটা সময় নেয়। তখনো তো ঘড়ি আবিষ্কার হয়নি! সময় নিরুপণ করবে কি দিয়ে? বুদ্ধিমান বালক তার নাড়ীটা টিপে ধরলো—আর নাড়ীর দপ্‌দপানি থেকে সময়ের একটা মোটামুটি হিসেব সে

পেলো। কে ওই বালক ? ওই বালক হলো গ্যালিলিও—প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ্ বলে যাঁর নাম পরে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

বালক দেখলো, ঘড়িটা বেশি দূর দূর দুলুক বা কম কম দুলুক অর্থাৎ, দোলনের বিস্তার বেশি হোক বা কম হোক সময় একই লাগে। শুধু এখানেই শেষ নয়, বালক ওই ঝুলন্ত আলোটা নিয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করলো যে, ওই দোলক লম্বায় ছোট হলে তাড়াতাড়ি দুলবে— সময় কম লাগবে। আর লম্বায় বড় হলে দুলতে সময় লাগবে বেশি। সতেরো বছরের ছেলে গ্যালিলিও এই যে তথ্যটি আবিষ্কার করলো—তাই হলো দোলক-ঘড়ি তৈরীর গোড়ার কথা। আর এই কৌশলের উপর নির্ভর করেই পরবর্তীকালে মানুষ তৈরী করলো 'দেয়াল ঘড়ি' বা 'দোলক ঘড়ি'—যা আজকাল অফিস-কাছারী ছাড়াও প্রায় প্রতিটি বাড়ীর দেয়ালে তোমরা দেখতে পাও। কিন্তু বর্তমান 'দোলক ঘড়ি'র বহিরাবরণের সৌন্দর্য ও যান্ত্রিক উন্নতি যতই হোক মূলতঃ গ্যালিলিওর নিয়মের কোন পরিবর্তন হয়নি। এখন আমরা



করি কি ? দোলক ঘড়ি ফাষ্ট যাচ্ছে—তলার স্ক্রুটা ঘুরিয়ে পেণ্ডুলাম বা দোলকের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দি। শ্লো যাচ্ছে—স্ক্রুটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে দৈর্ঘ্য ছোট করি। এই মাত্র।

বর্তমান যুগে দোলকযন্ত্র ছাড়াও আরো উন্নত ধরনের ছোট ছোট ঘড়ি আবিষ্কৃত হ'য়েছে, যা প্রতিটি মানুষের হাতের শোভা বর্দ্ধন করছে এবং সহায়তা করছে সঠিক সময় নির্দ্ধারণে; কিন্তু এমন একদিন ছিলো যখন মানুষ 'সূর্য ঘড়ি', 'জল ঘড়ি' ও 'বালির ঘড়ি'র সাহায্যে সময়ের হিসেব রাখতো। তখনো কিন্তু মানুষের সময়-জ্ঞান আমাদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না।

অণুবীক্ষণ ॥

অণুবীক্ষণ মানুষের দৃষ্টিকে এক অদৃশ্যলোকে নিয়ে গিয়েছে—যে লোকের পরিচয় সে খালি চোখে পায়নি। আজ-কালকার চিকিৎসা বিদ্যার মূলে আছে জীবাণু আবিষ্কার—আর জীবাণু আবিষ্কার সম্ভব হলো অণুবীক্ষণের সাহায্যে—এটা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। শুধু তাই নয়—অণুবীক্ষণ প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যাকে আজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।

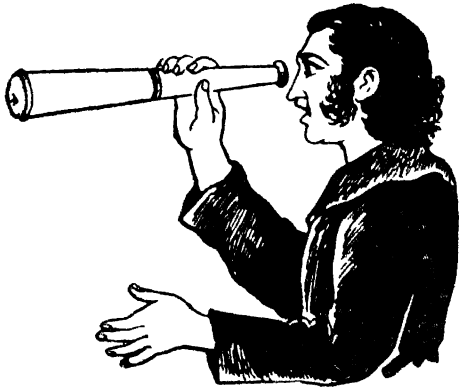
বহু যুগ আগে থেকে মানুষ এটা লক্ষ্য করেছে যে-জল বোঝাই একটা গোল কাচের পাত্রের ভিতর দিয়ে দেখলে অন্য দিকের জিনিস বড় দেখায়। প্রাচীন যুগে মনিরত্ন প্রভৃতিতে যারা সূক্ষ্ম কাজ করতো—তারাও সম্ভবত পদার্থকে বড় করে দেখবার একটা ব্যবস্থা করেছিলো। তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছো যে, চশমার লেন্স দিয়েও পদার্থকে বড় করে দেখা যায়।

সে আজ প্রায় তিনশ বছর আগের কথা। যারা চশমা তৈরী করতো, তাদের কাছে গিয়ে এণ্টনি লিউয়েন হোয়েক বলে এক ভদ্রলোক কাচ ঘষে লেন্স তৈরী করবার কৌশল শিখলেন। আর শেষ অবধি তিনি এমন একখানা লেন্স তৈরী করলেন—যা দিয়ে একটি পদার্থের ব্যাস প্রায় দেড়শ' গুণ বড় দেখায়। লিউয়েন হোয়েকই তাঁর এই লেন্স দিয়ে সর্বপ্রথম জীবাণু আবিষ্কার করলেন।

অণুবীক্ষণ সৃষ্টির গল্পটা এই রকম :

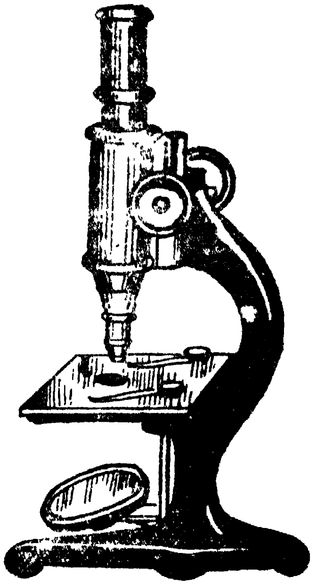
ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছিলো।

লিউয়েন হোয়েক বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি ধাতব নির্মিত চোঙ্গা



লিউয়েন হোয়েক

দিয়ে কি যেন দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোঙ্গার লেন্সের ওপর ছিটকে এসে পড়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন : মেরিয়া, মেরিয়া, দেখে যা এক ফোঁটা জলের মধ্যে কত কি কিলবিল কিলবিল করছে।



মেরিয়া ছুটে এলো। দেখলো,—সত্যিই এক ফোঁটা জলের ভিতর অসংখ্য ছোট ছোট জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

উৎসাহ বেড়ে গেলো তাঁর। এবার আর বৃষ্টির জল নয়—শুরু হলো নদী-নালা, খাল, বিল, পুকুরের জল নিয়ে পরীক্ষা। কিন্তু

সেই একই দৃশ্য দেখলেন লিউয়েন হোয়েক। দেখলেন—সব জলেই একপ্রকার জীব কিলবিল কিলবিল করছে- যা এর আগে মানুষ খালি চোখে দেখতে পায়নি।

এ খবর দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটি এ তথ্যকে সত্য বলে মেনে নিলো। আর এ ভাবেই একজন অখ্যাত লোক বিখ্যাত হলো—সৃষ্টি হলো অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং আবিষ্কার হলো জীবাণুলোক।

॥ দূরবীক্ষণ ॥

আমরা দূরের জিনিসকে কাছে দেখতে চাই- দেখতে চাই বড় করে—এমনকি, খালি চোখে দূরের যে সব জিনিস দেখা যায় না তাদেরও দেখতে চাই। পেলাম দূরবীক্ষণ।

দূরবীক্ষণ সৃষ্টির গল্পটা এই রকম :

হল্যাণ্ডের একজন চশমা ব্যবসায়ী যখন বাইরের কোন কাজে গিয়েছিলেন তখন দোকানের একটি ছেলে নানা রকমের লেন্স



নাড়াচাড়া করতে করতে দু'রকমের দু'খানা লেন্স সাজিয়ে দেখলো দূরের গির্জার মাথাটা বড় দেখাচ্ছে।

মনিব ফিরে এলে ছেলেটি তাঁকে ওটা দেখালো।

চশমা-ব্যবসায়ী ওটা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। তাঁর কৌতূহল বাড়লো। ফলে তিনি নিজেই একটি দূরবীণ তৈরী করলেন। পৃথিবীতে এই প্রথম দূরবীণ তৈরী হলো। সেটা ইংরেজী ১৬০৮ সালের কথা।

একথা চাপা রইলো না। শুনলেন প্রখ্যাত গণিতবিদ, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। খবর পেয়েই তিনি ওই যন্ত্রের মূল কথাটা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বেশী সময় লাগলো না—পরের বছরই তিনি এক শক্তিশালী দূরবীণ তৈরী করলেন। শুধু তাই নয়—ধীরে ধীরে গ্যালিলিও তাঁর যন্ত্রের উন্নতি করতে লাগলেন এবং তাঁর তৈরী দূরবীণ দিয়েই তিনি সূর্যের কলঙ্ক দেখলেন—চাঁদের পর্বত দেখলেন—দেখলেন বৃহস্পতির চাঁদ। এছাড়া সেই দূরবীণ দিয়ে আকাশে আরো অনেক জিনিষ তিনি লক্ষ্য করলেন যা খালি চোখে দেখা যায় না।

তিনিই প্রথম বলেছিলেন—পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

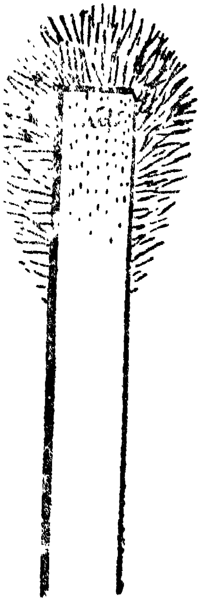
কিন্তু দূরবীণ সৃষ্টিকর্তা গ্যালিলিওর কথা সেদিন কেউ বিশ্বাস করেনি—অকথিত অত্যাচার হয়েছিলো তাঁর ওপর—আজ সেই প্রমাণিত সত্যকে বিশ্বাস করে তাকে সম্মান দেয়।

॥ চুম্বক ॥

প্রাচীনকালে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জানতো যে এক টুকরো এবনাইট কাঠ বা রজনকে যদি রেশম-এর দ্বারা ঘর্ষণ করা যায় এবং তার কাছে যদি কোন হালকা বস্তু রাখা হয়, তাহলে হাল্‌কা বস্তুগুলি নাচতে নাচতে কাঠ বা রজনের দিকে ছুটে আসে।

সে সময়ে মধ্য এসিয়ার ম্যাগনেশিয়া প্রদেশে একরকম পাথর পাওয়া যেতো, যা লোহার খণ্ডকে আকর্ষণ করতে পারতো। ঐ প্রদেশের নাম অনুসারে ওই পাথরকে বলা হোত 'ম্যাগনেটাইট।'

মানুষ চিরদিনই খেয়ালী। তাই সে একদিন ওই ম্যাগনেটাইটকে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিলো। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো, পাথরটি ঝাঁপ খেয়ে দুলতে দুলতে একদিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। যতবার যত জোরেই তাকে ঘোরানো হোলো প্রতিবারই পাথরটির দুই মুখ ঠিক নির্দিষ্ট দু'দিকে ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। বৈজ্ঞানিকরা পাথরটির ওই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে, দু'টি মুখের আলাদা আলাদা নামকরণ করলেন। তাঁরা এক মুখকে বললেন 'উত্তর পোল' বা North Pole ও আর এক মুখকে বললেন 'দক্ষিণ পোল' বা South Pole.



পরে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস এর নজরে পড়লো ওই ম্যাগনেটাইট পাথরটি। তিনি পাথরের ওই বিস্ময়কর আচরণ লক্ষ্য করে ওই পাথরের সাহায্যে আবিষ্কার করলেন 'দিগ্‌দর্শন যন্ত্র'- যা সমুদ্রপথের দিশাহারা নাবিকদের কূলের সন্ধান দিলো।

এছাড়াও সে যুগের বৈজ্ঞানিকরা ওই পাথর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, ওই পাথরের দ্বারা অন্য লোহার টুকরোকে ঘর্ষণ করলে তাও অনুরূপ আকর্ষণী শক্তি লাভ করে। একেই বলা হয় চুম্বক শক্তি। শুধু তাই নয় যদি সেই লোহার পাতটি টুকরো টুকরো করা হয়, তাহলেও তার দুটি মুখ নির্দিষ্ট দু'দিকে ফিরে দাঁড়ায়। এটাই প্রতিটি ম্যাগনেটের ধর্ম।

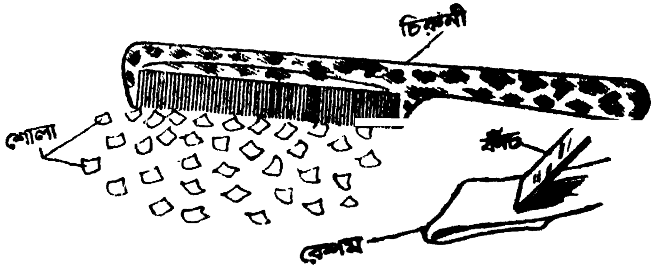
বৈজ্ঞানিকরা তখন এ নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু করলেন। একটা টেবিলের উপর লোহাচুর ছড়িয়ে তার মাঝে একটি ম্যাগনেট রেখে দেখলেন যে, লোহাচুরগুলির যেন টনক নড়ে উঠলো—তারা সারিবদ্ধভাবে এক একটি রেখায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

বৈজ্ঞানিকরা এই রেখাগুলোর নাম দিলেন 'চুম্বক রেখা'। ক্রমশঃ ম্যাগনেটের নানা সংস্করণ হলো। ঘড়ির মতো ছোট এক চুম্বকের কাঁটা রাখা হলো। একটি জোবালো ম্যাগনেটকে টেবিলের উপর সাদা কাগজে বসানো হোল। তারপর ধীরে ধীরে ওই ঘড়িটিকে ম্যাগনেটের একটি মুখের নিকট বসানো হোল। কাঁটা যেই ঘুরলো একটি দাগ কাটা হল। এভাবেই বৈজ্ঞানিকরা চুম্বকের আচরণ বা প্রকৃতি লক্ষ্য করে চুম্বক ক্ষেত্রের (Magnetic field) সুন্দর একটি মানচিত্র তৈরী করলেন।

পরে যখন তড়িৎ শক্তির দ্বারা চুম্বক ক্ষেত্র তৈরী করা সম্ভব হলো, তখনই তড়িৎ বিজ্ঞানের নব অধ্যায়ের সূচনা হলো।

॥ বিদ্যুৎ ॥

তোমরা অনেকেই হয়তো একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো যে, শীতকালে একটি প্লাসটিকের চিরুণী দ্বারা চুল আচড়ে, একটি কাচের পাতকে রেশম কাপড় দিয়ে ঘষে বা একটি রবারের



নলকে ফ্লানেল কাপড় দিয়ে ঘষে, কাগজ বা শোলার কুচির উপর ধরলে কুচিগুলি ওদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে, আবার বিকৃষ্ট হয়ে দূরে চলে যায়। ঘর্ষণের ফলে ওই সকল

পদার্থে একপ্রকার শক্তি জন্মে যার জন্য ওরা কুচিগুলিকে আকর্ষণ করে। ওই অদৃশ্য শক্তিকে বলে 'বিদ্যুৎ'। ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় বলে একে বলা হয় 'স্থির বিদ্যুৎ'।

আগের দিনের মানুষও কিন্তু ঘর্ষণের এই আকর্ষণী শক্তি লক্ষ্য করেছে। আজ থেকে প্রায় বহু বছর আগে দার্শনিক থ্যালাস আবিষ্কার করেন যে, অ্যাম্বার (পাইন গাছের আঠা) নামক পদার্থকে রেশম কাপড় দিয়ে ঘসলে তা মাথার শুকনো চুল, কাগজের টুকরো, পালক প্রভৃতি হালকা জিনিসকে আকর্ষণ করে নিজের কাছে টেনে আনে। তিনি কিন্তু বিদ্যুৎ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না কাজেই তিনি এ ব্যাপারে আর বেশিদূর অগ্রসর হননি।

তখন মধ্য এশিয়ায় 'লোড-ষ্টোন' বা ম্যাগনেটাইট নামক একপ্রকার পাথর পাওয়া যেতো—যা ঝুলিয়ে রেখে ছুলিয়ে দিলেও নির্দিষ্ট একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতো। পাথরটির এই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করেন বৈজ্ঞানিক প্লেরি প্লীনাস। তারপর [illegible] এই পাথর নিয়ে গবেষণা করেন, [illegible] দুটি [illegible]

[illegible] দুটি ঘটনা থেকেই [illegible] হয় 'তাড়িৎ বিজ্ঞান'। কারণ পরবর্তীকালে এই সামান্য দুটি ঘটনাকে নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে অনেক চিন্তা-ভাবনা আর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিক গিলবার্ট বললেন—এই অদৃশ্য শক্তির পিছনে আছে 'ইলেকট্রিসিটি' বা বিদ্যুৎ। ১৭৮০ সালে গ্যালভানি ব্যাঙ নাচিয়ে প্রমাণ করলেন, এই বিদ্যুৎকে যান্ত্রিক উপায়েও তৈরী করা যায়। এই সূত্র ধরেই আবিষ্কার হলো 'গ্যালভানোমিটার'। প্রমাণ হলো, বিদ্যুৎ গতিশীল।

এর পর বৈজ্ঞানিক ভোল্টা এ সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে আবিষ্কার করলেন 'ভোল্টার সেল'। তারপর এলেন লেকলাঙ্কি—আবিষ্কার হলো 'লেকলাঙ্কী সেল'। এলেন মাইকেল ফ্যারাডে।

১৮৩১ সালে তিনি দেখালেন যে, চুম্বক ও তড়িৎ পরস্পর নিকটবর্তী হলে এক 'চুম্বক ক্ষেত্র' তৈরী করে। ফলে আবিষ্কার হলো 'ইলেকট্রো ম্যাগনেট'। এলেন এডিসন, তিনি আবিষ্কার করলেন



এডিসন

'বিজলী বাতি'। মোর্স আবিষ্কার করলেন টেলিগ্রাফ। আর গ্রাহাম বেল আবিষ্কার করলেন টেলিফোন। সে সবই সম্ভব হলো ইলেকট্রো ম্যাগনেটের দৌলতে। বড় হয়ে তোমরা এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে। আমি শুধু আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু তোমাদের শোনালাম।

॥ ষ্টিম ইঞ্জিন ॥

সরাচাপা মাটির হাঁড়িতে জল যখন ফুটতে থাকে, তখন সরাখানা ঢক্‌ঢক্‌ করে ওঠা-নামা করে, আগের দিনের মানুষও তা দেখেছে। কিন্তু ওই দেখা অবধি—কেন ওই রকম ওঠা-নামা করে,—তা নিয়ে তখনকার মানুষ কোনরকম মাথা ঘামায় নি।

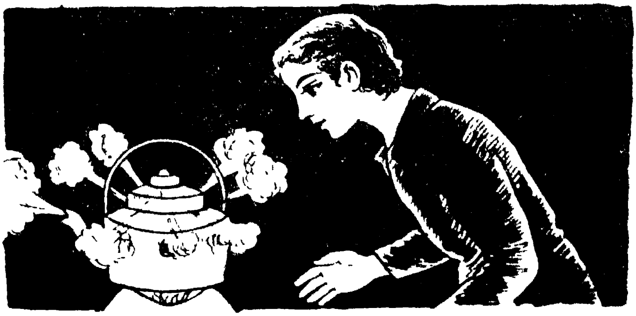
তারপর অনেক দিন চলে গেলো। একদিন জেম্‌স্‌ ওয়াট নামক এক যুবকের চোখে পড়লো এই দৃশ্য। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, তিনি এই দৃশ্য দেখার পরই আবিষ্কার করেছিলেন 'ষ্টিম ইঞ্জিন'। গল্পটা এই রকম ঃ



জেমস ওয়াট

জেমস্‌ ছিলেন অলস প্রকৃতির ছেলে। লেখাপড়ার দিকেও তাঁর মন ছিলো না। বেশির ভাগ সময়েই বাড়িতে বসে কাটাতেন। মাঝে মধ্যে বড় জোর নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। এরজন্যে বকুনিও খেতেন যথেষ্ট। একদিন জেম্‌স্‌ ওয়াট রান্না ঘরে গিয়ে দেখলেন, একটি জলপূর্ণ কেটলি জ্বলন্ত উনানের উপরে বসানো রয়েছে। সময়টা ছিলো শীতকাল। সুতরাং অলস বালক উনুনের পাশে বসে পড়লেন। উনুনের গরম তাপটা বেশ লাগছিলো তাঁর। হঠাৎ তিনি দেখলেন, কেটলির ঢাকনিটা ঢক্‌ঢক্‌ করছে—ওঠা-নামা করছে, আর সেই ফাঁক দিয়ে সাদা ধুয়োর মত সূক্ষ্ম জলের কণিকা বা বাষ্প বেরিয়ে আসছে। তিনি একাগ্রচিত্তে তা লক্ষ্য করলেন। তারপর ঢাকনিটা তুলে নিয়ে

তার উপর একটা ঠাণ্ডা পেয়ালা ধরলেন। ঠাণ্ডা পেয়ালার সংস্পর্শে এসে সেই বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হলো। তা খুব মনযোগের সঙ্গে দেখলেন। দেখে পুনরায় কেটলির ঢাকনিটা কেটলির উপর চেপে দিলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। আবার কেটলির ঢাকনিটা ঢক্ ঢক্ করতে লাগলো। আর তার পাশ দিয়ে



বেরুতে লাগলো ভক ভক করে বাষ্প। এই দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখার পর তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। ডুবে গেলেন চিন্তার জগতে।

ভেবে ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, জল যখন এরূপ উত্তাপের সাহায্যে বাষ্পাকারে পরিণত হয় তখন তার প্রকৃতিও একেবারে বদলে যায়। তার অণুগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে চায়। নিশ্চয়ই এরূপ জলীয় বাষ্পের একটি ভয়ানক শক্তি আছে। আর এই শক্তিটি বাষ্পের চারদিকে ছড়িয়ে যাবার বা ছুটে যাবার ব্যগ্রতা থেকে জন্মে। এই বাষ্পকে যদি কোন একটি পাত্রে আবদ্ধ করে রাখা যায়, তাহ'লে তা সেই আবদ্ধ জায়গা হতে বেরিয়ে এসে অসীম আকাশে ছুটে যাবার জন্যে জোর জবরদস্তি করতে থাকবে। শুধু তাই নয়—তিনি আরো ভাবলেন, যদি কোন পাত্রে এভাবে ক্রমাগত বাষ্প সঞ্চিত করে, ঐ পাত্রের সমস্ত মুখ বন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে সেই ক্রুদ্ধ সঞ্চিত

বাষ্প এমন এক ভয়ানক আসুরিক শক্তি লাভ করবে যে তা যে কোন কঠিন ধাতু নির্মিত পাত্র ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে। তবে কেন এই আসুরিক শক্তিকে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করা যাবে না? তিনি সুরু করলেন গবেষণা এবং ইংরেজী ১৭৬৯ সালে বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করলেন 'ষ্টিম ইঞ্জিন' যা যান্ত্রিকজগতে নিয়ে এলো এক অভাবনীয় যুগান্তর।

॥ রেল-ইঞ্জিন ॥

দ্রুতগামী যানবাহনের মধ্যে রকেট, বিমানের পরই রেলগাড়ী। আর এই রেলগাড়ীটিকে চালিয়ে নিয়ে যায় রেলইঞ্জিন। কাজেই এই অভিনব ইঞ্জিনটি কিভাবে আবিষ্কার হলো, তা নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে তাই না? তারই সংক্ষিপ্ত গল্প এখানে বলছি শোন।

আগেই বলেছি, জেমস্ওয়াট ষ্টিম ইঞ্জিন তৈরী করেছিলেন। আর এই ষ্টিম ইঞ্জিনের প্রতি সর্বপ্রথম যাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তাঁর নাম জর্জ ষ্টিফেনসন। জর্জ ষ্টিফেনসন তখন কয়লার খনিতে কাজ করতেন। তাঁর কাজ ছিলো কয়লার ভিতর থেকে পাথরের নুড়িগুলোকে বেছে আলাদা করা। পাঠ্য জগতের সঙ্গে তখনো তাঁর কোন সম্পর্ক ছিলো না। অথচ তিনি ওয়াটের তৈরী ষ্টিম-ইঞ্জিন সম্বন্ধে বড় বেশী কৌতূহলী হয়ে পড়লেন। কিন্তু লেখাপড়া না জানার জন্যে ইঞ্জিনটি যে কি ভাবে তৈরী করা হয়েছিলো তা তিনি বুঝতে পারতেন না। অথচ তাঁর অদম্য কৌতুহল নতুন কিছু সৃষ্টি করতে।

এই প্রেরণাই তাঁকে নিয়ে গেলো নৈশবিদ্যালয়ে। সেখানকার কয়েকটি ধাপ এগিয়েই ষ্টিফেনসন আরম্ভ করলেন ষ্টিম-ইঞ্জিন নিয়ে নাড়াচাড়া। এভাবে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করতে করতে অবশেষে,



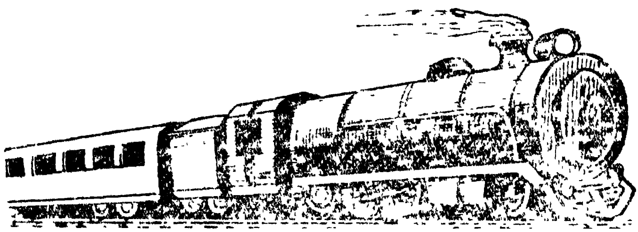
জর্জ ষ্টিফেনসন

তিনি ইঞ্জিনেব ভিতরকার জটিল যন্ত্রাংশের এবং ওই সকল যন্ত্রাংশের কার্যকারিতা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হন। চেষ্টা করেন আরো অগ্রসর হতে। তারপর আসল রহস্যটা বুঝতে পেরে ভাবতে থাকেন—এই বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আরো শক্তিশালী ইঞ্জিন কি তৈরী করা যায় না—যা দ্রুতগামী কোন যানের সঙ্গী হবে ?

যেমনি ভাবা অমনি কাজ। শুরু করলেন গবেষণা। দিনের পর দিন. মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে অবশেষে, ১৮১৪ সালে ষ্টিফেনসন তৈরী করলেন একটি রেলইঞ্জিন। সেটিকে চালু করা হলো, চললোও। কিন্তু নানা ত্রুটি থেকে গেলো। তাই তিনি ঠিক করলেন ইঞ্জিনটিকে ত্রুটিশূন্য করবেন। দীর্ঘদিন সাধনা ও পরিশ্রম করে অবশেষে তিনি সাফল্যলাভ করলেন। অর্থাৎ, ত্রুটি শূন্য

ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু ইঞ্জিন তো তৈরী হলো এবার দরকার রেল লাইন।

ষ্টিফেনসন বাধাপ্রাপ্ত হলেন এখানেই। অনেকেই তাঁর এই পরিকল্পনার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বললেন, রেল-লাইন তৈরী করে তার উপর দিয়ে গাড়ী চালালে অনেক জন্তু-জানোয়ার গাড়ীচাপা পড়ে মারা পড়তে পারে, সেই সঙ্গে মানুষের শান্তিও বিঘ্নিত হতে



ইঞ্জিন ও রেললাইন

পারে। কিন্তু ষ্টিফেনসন সমস্ত বাধা অতিক্রম করে দীর্ঘ দশ বছর অমানুষিক পরিশ্রম করে তৈরী করলেন সুদীর্ঘ রেলপথ।

তারপর ?

তারপর ইংরেজী ১৮২৪ সালে প্রায় ৫০০ জন যাত্রী সমেত আটত্রিশখানা বগি জুড়ে তাতে রেলইঞ্জিন লাগিয়ে নিজেই যখন হাজার হাজার কৌতূহলী দর্শকের সামনে ঘণ্টায় বারো মাইল বেগে গাড়ি ছুটিয়ে নিরাপদে লাইনের শেষ সীমানায় এসে দাঁড়ালেন তখন হাজার হাজার দর্শক তাঁকে জানালো স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

॥ মোটরগাড়ী ॥

জেমস ওয়াট ষ্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন ১৭৬৯ সালে। তাই দেখে উৎসাহিত হয়ে ষ্টিফেন্‌সন আবিষ্কার করলেন 'রেল-ইনজিন'। সেটা ইংরেজী ১৮১৪ সালের কথা। তখনকার রেল গাড়ির গতি ছিলো অত্যন্ত মন্থর। মানুষ এই মন্থর গতি যানে তৃপ্তি পায়নি। তাই সে চায় জোরে— আরো জোরে ছুটতে।

এই ছোটার নেশায় মানুষ চেষ্টা করতে লাগলো আরো গতি-সম্পন্ন ইন্‌জিন তৈরী করতে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও বাষ্প-চালিত ইন্‌জিনে এই গতি মানুষ পেলোনা। একজন চেষ্টা করলেন, বাষ্পের বদলে বারুদে আগুন দিয়ে তার ধাক্কায় ইঞ্জিনটিকে চালাতে। কিছুটা সফল তিনি হলেন। কিন্তু অনেকেই তাঁকে পাগল বলে উড়িয়ে দিলেন। পাগল বললেও লোকটা যা করেছিলো—তা ঠিকই করেছিলো। কেন না এখন তারই পদ্ধতিতে মোটরগাড়ী চলে, তবে বারুদের বদলে ব্যবহৃত হয় পেট্রল।

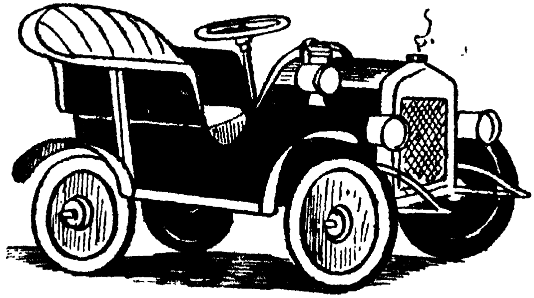
যা হোক, বারুদের পরিবর্তে আবার কয়েকজন কয়লার গ্যাসের সাহায্যে ইনজিন চালানোর কথা ভাবলেন। চালালেনও। কিন্তু তখনো এই গ্যাসের কারখানা বেশি ছিল না বলে এই পদ্ধতি কার্যকরী হলো না।

ইংরেজী ১৮৯৩ সালে মোটরগাড়ীর একটা যুগান্তর এলো। এই সময় জার্মান বিজ্ঞানী 'দেইম্‌লার' আবিষ্কার করলেন পেট্রলের ব্যবহার। মোটরগাড়ী রাস্তায় চললো। কিন্তু রাস্তার অভাবে জার্মানে এ গাড়ীর উন্নতি হলো না।

অবশেষে এগিয়ে এলো ফরাসীদেশ। ফরাসী বিজ্ঞানী Levassor পেট্রলে মোটর চলার উপযোগী রাস্তা তৈরী করালেন। গাড়ী চললো। কিন্তু নানা ত্রুটি থেকে গেলো। ওই ত্রুটি

সংশোধন করে গাড়ীকে আরো দ্রুত গতিসম্পন্ন করে তুললেন, ফরাসী দেশের আরো দু'জন বিজ্ঞানী। তাঁদের নাম কাউন্ট দ্য আলফের্ন ও চার্লস দ্য বনটন। সেটা ১৮৯৪ সালের কথা। এরপর ১৮৯৬ সাল থেকে ফরাসী দেশে মোটরগাড়ী নিয়মিত চালু হলো।

এবার সুরু হলো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব। ইংলণ্ড তখন পিছিয়ে আছে অনেকটা। তারাও এ ব্যাপারে এগিয়ে এলো। তৈরী করলো মোটরগাড়ী। কিন্তু ভালো রাস্তার অভাবে গাড়ী



চলাচলের অসুবিধা দেখা দিলো। যাও বা চলতো তাও ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভা এমন এক আইন পাশ করলো—ঐ গাড়ীর আগে আগে একজন লাল পতাকা নিয়ে ছুটবে। এও কি সম্ভব! কাজেই ইংলণ্ড পিছিয়েই রইলো।

আবার এগিয়ে গেলো ফরাসী। ১৯০০ সালে যে গাড়ী ঘণ্টায় পনেরো মাইলের বেশী ছোটেনি, ১৯০২ সালের মধ্যে ওরা সেই গাড়ীর গতি করলো পঁচিশ মাইল। শুধু তাই নয়—মোটর গাড়ীর উন্নতির জন্যে সুরু করলো দৌড় প্রতিযোগিতা।

তাই না দেখে বৃটেনের কারিগররা মোটরগাড়ী তৈরী করে সেই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে তৈরী হলেন। তাঁরা মোটরগাড়ী তৈরী করলেন। বেশ দ্রুতগতি সম্পন্ন মোটরগাড়ী।

তারপর?

তারপর ইংরেজী ১৯০২ সালে প্যারিস থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত মোটরগাড়ী চালানোর প্রতিযোগিতায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে ওরাও যোগ দিল। সেই প্রতিযোগিতায় ফরাসী দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলো ইংলণ্ড। এভাবেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মোটর-শিল্প এগিয়ে চললো—আজো চলছে—ভবিষ্যতেও চলবে।

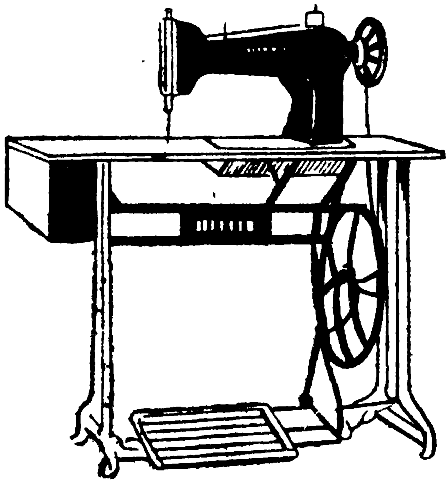
॥ সেলাই মেসিন ॥

এখন আর সেলাই মেসিনের উপকারিতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই নতুন করে কিছু বলার নেই- কি বলো? কেন না আজ দোকান ছাড়াও প্রত্যেকের ঘরে ঘরে রয়েছে সেলাই মেসিন এবং সকলেই তোমরা এর সঙ্গে পারিচিত। কিন্তু এটা আবিষ্কার করতে কত লোকের সাধনা, কত পরিশ্রম যে ব্যয় হয়েছিলো তা হয়তো তোমরা জানো না - আর জানো না বলেই হয়তো আজ সেলাই মেশিন সম্বন্ধে তোমাদের আর কৌতূহল নেই—কি তাই না? তবে শোন সেই গল্প।

টমাস সেন্ট নামে একজন ইংরেজ ১৭৯০ সালে সর্বপ্রথম সেলাই মেসিন উদ্‌ভাবন করেন। কিন্তু সে মেসিনে কাপড় সেলাই করা যেতো না—চামড়া সেলাই করা হোতো। এর বছর কয়েক পরে, সম্ভবত ১৭৯৪-৯৫ সালে টিমোমনিয়ার নামে একজন ফরাসী দরজী কাপড় সেলাইয়ের জন্যে সেই ব্যবস্থায়ই আরো একটি উন্নত ধরনের মেসিন তৈরী করেন এবং এ ধরনের ৮০টি মেসিন নিয়ে একটি কারখানা গড়ে তোলেন। কিন্তু সেখানকার দরজীরা তাদের রুজিরোজগার বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কায় দলবদ্ধভাবে সেই কারখানা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়—এমনকি, মেসিনগুলি পর্যন্ত নষ্ট করে

ফেলে। এরপর নতুন মেসিন তৈরী করে টিমোমোনিয়ার কারখানা পুনরায় চালু করেছিলেন, কিন্তু তেমন আর সাফল্যলাভ করতে পারেননি। শেষ সময়ে একরকম প্রায় নিঃস্বভাবেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইংরেজী ১৮৩৩ সালের ওয়ালটার হান্ট নামে একজন আমেরিকান ফরাসী দরজীর চেয়েও আরো উন্নত ধরনের একরকম সেলাই মেসিন তৈরী করেন। কিন্তু তিনি তাঁর আবিষ্কারের স্বীকৃতি না নেওয়ায় এতে তার কোন উপকার হয়নি। এর কয়েক বছর পর ইলিয়াস হাউই নামে একজন আমেরিকান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অনেকটা হান্টের অনুকরণে একটি সেলাই মেসিন তৈরী



করেন। মেসিন তো তৈরী হলো—কিন্তু, সূচের পিছনে সুতো না পরানো থাকলে যন্ত্রের সাহায্যে কাপড়ের এফোঁড় ওফোঁড় সেলাই সম্ভব হবে কেমন করে? তখনো পর্যন্ত এই সমস্যাই ছিলো প্রধান সমস্যা। অনেকদিন পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। হাউই যে সেলাই মেসিন তৈরী করেছিলেন, সেটা অনেক ঘোরালো উপায়ে। অথচ সব সমস্যারই সমাধান হতে পারে যদি সূচের পিছনের ছিদ্রটা ডগায় আনা যায়। কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, দিনের

পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সাধনা ও পরিশ্রম করেও এ সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারেননি—এমন কি, হাউই নিজেও নন। এভাবে প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেলো।

একদিন রাত্রের ঘটনা। হাউই ঘুমের ঘোরে একটা স্বপ্ন দেখেন। বেশ বড় একটা বল্লম নিয়ে একজন রেড্ ইনডিয়ান তাঁকে আক্রমণ করছে। তাঁকে চিৎ করে ফেলে বল্লমের ফলাটা বুকে বিঁধে দেয় আর কি! ফলাটা প্রায় তাঁর নাকের কাছে এসে পড়েছে কিন্তু আশ্চর্য লাগলো—ফলাটার ডগায় লম্বাটে একটা ফুটো কেন? এ দৃশ্য দেখার পর ঘুম ভেঙ্গে গেলো তাঁর। তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। তার মনে পড়তে লাগলো, বল্লমটার ডগায় ছিদ্র কেন? হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, আচ্ছা, ছিদ্রটা যদি পিছন থেকে সূচের ডগায় আনা যায় তবেই তো সেলাই কলের সমস্যা সহজে মিটে যায়। আর দেরী করলেন না হাউই। সে রাত্রেই তিনি কাজে লেগে গেলেন এবং অচিরেই ডগায় ছিদ্রওয়ালা সূচ তৈরী করে সেলাই মেসিনের প্রধান সমস্যা সমাধান করে মেসিনটিকে সহজ করে তুললেন। ভেবে দেখ, একটি আকস্মিক তুচ্ছ ঘটনা কিভাবে একটি জটিল সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে গেলো।

॥ থার্মোমিটার

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তাপে পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়। আর তাপের এই ধর্ম কাজে লাগিয়েই বৈজ্ঞানিকরা তৈরী করলেন উষ্ণতা মাপবার যন্ত্র। যাকে আমরা বলি—থার্মোমিটার। কেমন করে:

মনে করো কয়েকটি পাত্রে জল আছে। কিন্তু জলের উষ্ণতা সব পাত্রে সমান নয়। একটা লোহার ডাণ্ডা নাও। আর সেই

ডাণ্ডাটা একটা জলের পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে তার দৈর্ঘ্য মাপো। দৈর্ঘ্যটা টুকে রাখো। এখন তুলে নিয়ে ডাণ্ডাটা আর একটি জলভরা পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে আবার ওর দৈর্ঘ্য মাপো। যদি দেখো দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে, তাহলে বুঝবে, দ্বিতীয় পাত্রের জল অপেক্ষাকৃত বেশি গরম। তাই বলে মনে করোনা লোহার ডাণ্ডাটা থার্মোমিটার হতে পারতো, কারণ গরম-ঠাণ্ডায় ওর বাড়া কমাটা এত অল্প যে সহজে সেটা মাপা যায় না।

বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে চিন্তা করলেন। দেখলেন কঠিন পদার্থের চেয়ে তরল পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি। এমন কি গ্যাসীয় পদার্থে আরো বেশি। বেশ, এক কাজ করা যাক্। লোহার ডাণ্ডার বদলে কিছুটা গ্যাসীয় পদার্থ নেওয়া যাক, যেমন বায়ু। তবে হ্রাস-বৃদ্ধি অনেক বেশি হবে, সহজে মাপা যাবে। কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থ নাড়াচাড়া করার অনেক অসুবিধা আছে। কাজেই বিজ্ঞানীরা যে কোন একটা তরল পদার্থ নেওয়াই ঠিক করলেন। নিলেন 'পারা'।

আবার ভাবলেন, পারা কেন, জল নিলে ক্ষতি কি ? আর জলের তো কোন খরচ নেই। পারা নেওয়ার অনেক সুবিধা, যেমন যে ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়, সে ঠাণ্ডায় তো নয়ই ; এমনকি তার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডায়ও পারা তরল অবস্থাতেই থাকে—জমে না। আবার যে গরমে জল ফুটতে থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি গরমে ও পারা ফোটে না—তরলই থেকে যায়। কাজেই পারা নেওয়াই সাব্যস্ত হলো।

এবার বৈজ্ঞানিকেরা এক কাজ করলেন। একটি সরু বিঁধের কাচের নল নিলেন। কাচের নল না নিলে ভিতরের পারার ওঠানামা দেখা যাবে না। এই নলের ভিতরে একটা বড় খোল করলেন। খোলটা বড় হওয়াতে ওর মধ্যে বেশি পারা ধরবে। সুতরাং তাপে পারার বৃদ্ধির পরিমাণও বেশি হবে, আর সেটা সরু নলের ভিতর দিয়ে অনেকটা দূর দূর ওঠা-নামা করবে। এবার পারা ভরে নলের মুখ বন্ধ করা হলো। তৈরী হলো থার্মোমিটার।

তারপর নলের গায়ে দাগ কেটে সংখ্যা বসিয়ে দেওয়া হলো। বিজ্ঞানের কাজকর্মে যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় সেন্টিগ্রেট স্কেল। এতে ০° দ্রবণাঙ্ক আর ১০০° স্ফুটনাঙ্ক ধরা হয়। কিন্তু সাধারণ কাজকর্ম, যেমন, বায়ুর উষ্ণতা কত হল, দেহের তাপ কত, এসব জানতে হলে ফারেনহিট স্কেল ব্যবহার করা হয়। এর দ্রবণাঙ্ক ধরা হয় ৩২° আর স্ফুটনাঙ্ক ২১২°, মাঝের জায়গাটা ১০০° ঘরে ভাগ করা হয়।

॥ ব্যারোমিটার ॥

ইংরেজী ১৬০০ কথা।

টস্কনির ডিউক একটা কূয়ো খুঁড়িয়ে তাতে একটা পাম্প লাগালেন। এর আগেও কিন্তু জল তোলার জন্যে পাম্প ব্যবহার করা হোত। কিন্তু এ কূয়োর জল ছিলো খুব গভীরে—৩৪ ফুটেরও বেশি নীচে। পাম্প দিয়ে কিছুতেই জল তোলা সম্ভব হলো-না। ডিউক অনেক ভেবে, প্রখ্যাত গণিতবিদ্, জ্যোতির্বিদ্, বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে এ সংবাদ জানালেন। গ্যালিলিও তখন বৃদ্ধ, রুগ্ন, শয্যাশায়ী। কাজেই তিনি নিজে যেতে না পেরে তার প্রিয় ছাত্র টরেসিলের উপর এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দিলেন। টরেসিল কূয়ো পরিদর্শন করে তার জলের গভীরতা মাপলেন। পাম্পটাও দেখলেন। তারপর ভাবতে লাগলেন, ওই লম্বা নলে যতটুকু উঁচু অবধি জল তোলা যাচ্ছে, তা সম্ভব হচ্ছে নলের অপর মুখে বায়ু ঠেলা দিচ্ছে বলে। আর এই রকম যদি হয়—তবে ৩৪ ফুটের কাছাকাছি উঁচু জলে স্তম্ভের যে ওজন—সেইটেই হবে বায়ুর চাপ। তিনি আরো ভাবলেন: বায়ু যদি ৩৪ ফুট জল ধরে রাখতে পারে, তাহলে জলের

বদলে যদি পারা নেওয়া যায় তবে পারা অনেক কম উঁচুতে উঠবে। কারণ পারা জলের চেয়ে সাড়ে তেরো গুণ বেশী ভারি। কাজেই ৩৪ ফুটের মাত্র সাড়ে তিন ভাগের এক ভাগ উঠবে। আর সেটা দাঁড়ায় প্রায় ২৯ ইঞ্চিতে।

পারা নেওয়া হলো। পারা ওই ২৯ ইঞ্চি উঠে দাঁড়ালো। আর উঠলো না। টরেসিল তার এক বন্ধুকে পরীক্ষাটা দেখালেন। বিজ্ঞানী বন্ধুটিও এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ বোধ করলেন। আর তাঁরা উপরিউক্ত সূত্র ধরে দুজনে মিলে মিশে বায়ুর চাপ মাপবার একটা যন্ত্র তৈরী করলেন। যন্ত্রটির নাম রাখলেন—'ব্যারোমিটার'।

এর পরই বিজ্ঞানী পাস্কাল প্রশ্ন তুললেন: আচ্ছা, বায়ুর চাপ যদি ব্যারোমিটারের পারাকে ঠেলে তোলে, তবে পর্বতের উপর তো বায়ুর চাপ কম—সেখানে তো পারা অতটা উঠবে না? পাস্কাল পরীক্ষা করলেন। তাঁর আত্মীয়কে ব্যারোমিটার দিয়ে কোন এক উঁচু পর্বতে পাঠালেন। সেখান থেকে খবর এলো—পারা তিন ইঞ্চি নেমেছে। তখন আর এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইলো না।

বাইরে বায়ুর চাপ যদি কমে তবে ব্যারোমিটারের পারা নামবে—আবার চাপ বাড়লে পারা উঠবে। ঝড়-বৃষ্টি হবার আগে বায়ুর চাপ কমে। কাজেই বুঝতে পারছো—ব্যারোমিটারের পারা নামছে দেখে বুঝতে হবে শিগ্‌গির ঝড়-বৃষ্টি আসছে। পারা কতটা উঁচুতে আছে তার সূক্ষ্ম মাপজোখ নিয়ে হাওয়া অফিস থেকে ঝড়-বৃষ্টি আসার খবর আগে থেকেই লোকদের জানানো হয়।

॥ ফোনোগ্রাফ ॥

সে আজ অনেকদিন আগের কথা। আমেরিকার একটি ছেলে টেলিগ্রাফের কাজ শিখবে বলে ঠিক করলো। অবশ্য দিনের বেলায় সামান্য বেতনে সে একটা টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতো। সে ভাবলো রাতেও কাজ করতে হবে, নতুবা কাজটা সে ভাল রকম আয়ত্ত করতে পারবে না। কেন না রাতে খবরের কাগজের জন্যে যে সব খবর তাড়াতাড়ি আসে—সেগুলি ঠিকমত ধরতে পারলে সে কাজে পাকা হবে—বেতনও বাড়বে। একদিন বালক রাতে যেখানে কাজ করতো সেখানকার মালিককে গিয়ে তার মনের কথা বললো। সে লোকটি সানন্দে বালকের প্রস্তাব গ্রহণ করলো। তারপর থেকেই দু'জনে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। বেশ চলছিলো। হঠাৎ এক বিপদ দেখা দিল। ওদিক থেকে যে টেলিগ্রাফ পাঠাত সে চলে গেলো। তার পরিবর্তে যে লোকটি এলো সে এত দ্রুত সংবাদ পাঠায় যে ওরা দু'জনেও সামলে উঠতে পারে না।

তখন বালক একটি কৌশল করল। সে দুটো পুরণো মর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্র যোগাড় করলো। তারপর সেই যন্ত্রে কাগজের একটা লম্বা ফিতা পরালো—আর যখন সংবাদ আসে তখন কাগজখানা টানতে থাকে। কাগজের উপর দাগ পড়ে—ভিন্ন ভিন্ন সংকেতের ভিন্ন ভিন্ন রকম দাগ। কাগজখানা এইবার দ্বিতীয় কলের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যায়—আর টরে টক্কা শব্দ বেরুতে থাকে। দ্বিতীয় কলে আস্তে আস্তে টানায় শব্দগুলি ধীরে ধীরে বেরোয়—ফলে ওদিকে সংবাদ তাড়াতাড়ি আসায় আর কোন অসুবিধা হয় না। ওরা এখন খুব খুশী। কাজ বেশ চলছে। তবে কেউ জানে না কি করে কি হচ্ছে। দিনের বেলায় কল দু'টি ওরা

লুকিয়ে ফেলতো। দাগওয়ালা কাগজ দেখে অনেকেই বুঝতে পারতো না—কেমন করে কাগজে দাগ হয়েছে, আর ঐ দাগের মানেই বা কি? এভাবে ওদের কাজ বেশ চললো।

যুক্তরাজ্যে তখন সভাপতি নির্বাচনের সময়। খবর খুব দ্রুত আসা-যাওয়া করছে। ওরা তাল সামলাতে পারলো না। কেন না ওদের ব্যবস্থায় যে সংবাদ আসবে সেগুলি প্রথমে কাগজে দাগ কাটবে,—তারপর সেই দাগ থেকে শব্দ বের হবে। এই করতে গিয়ে ওরা বেশ পিছিয়ে পড়লো। ফলে কর্তৃপক্ষেরও টনক নড়লো। খবরের কাগজ-ওয়ালারা হৈ-চৈ আরম্ভ করল। কি ব্যাপার।

কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা অনুসন্ধানে জানতে পারলো ওরা এদ্দিন কি করছিলো। কাজেই বুঝতে পারছো—বালকটি ধরা পড়ে গেলো কিন্তু টেলিগ্রাফ যন্ত্র দুটিকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চেয়ে নিলো।

টেলিগ্রাফ যন্ত্র দু'টি নিয়ে বালক ভাবতে লাগলো: কথা থেকে দাগ কাটা—আর সেই দাগ কাটা থেকে কথা বের করা—এ সম্ভব কি না। সে একটা যেমন-তেমন ব্যবস্থা করে নিলো—একটা টানটান চামড়ার গায়ে পিন লাগালো—পিনটা একখানা মোম লাগানো কাগজের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে, এমন ব্যবস্থা করলো। তারপর বালক চামড়ার সামনে গিয়ে 'হুঃ' করে একটা শব্দ করলো—সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানাকে একটু টানলো—কাগজখানায় একটা দাগ পড়ে গেলো। এবার বালক ওই দাগযুক্ত কাগজখানার দাগের গোড়ায় পিনটা বসিয়ে কাগজটা আবার টানলো—আর কান পেতে রইলো কিছু শোনা যায় কিনা। বালক খুব মৃদু অথচ বেশ স্পষ্ট 'হুঃ' শব্দ শুনতে পেলো। এবার সে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো, সেটা ১৮ই জুলাই ১৮৭৭ সাল। সেদিন বালক তার ডায়েরীতে লিখেছে:

একটা পর্দায় একটা পিন লাগানো—আর পিনটা একখানা মোম মাখানো কাগজে গিয়ে ঠেকেছে। পর্দার সামনে কথা বললুম আর কাগজখানা সরাতে থাকলুম। পিন কাগজের উপর দাগ কেটে

গেলো। এখন আমার মনে হচ্ছে—এই রকম করে মানুষের গলার আওয়াজ ধরে রাখতে পারবো।

বালক এবার যন্ত্রের উন্নতি করতে লাগলো। একটা বোর্ড নিলো—তাতে রাঙতা জড়ালো—পিনটা রাঙতার গায়ে ঠেকলো। পর্দার অপর দিকে একটা বড়ো চোঙ বসিয়ে কথা বলবার ব্যবস্থা করলো—ফলে পর্দার কাঁপুনি জোড়ালো হলো। চোঙটা ঘুরতে থাকলো। চোঙের সামনে বালক বললে :

Mary had a little lamb
Its fleece was white as snow.

রাঙতার উপর দাগ হয়ে গেলো। এবার দাগের উপর পিন বসিয়ে চোঙা ঘুরালো। কোন ভুল নেই—সেই শব্দ বেরতে লাগলো—

Mary had a little lamb
Its fleece was white as snow.

একেবারে স্পষ্ট। এমনি করেই পৃথিবীতে ফনোগ্রাফ সৃষ্টি হলো। যন্ত্রটা প্রথমে কানের কাজ করে শব্দ ধরলো—তারপর মুখের কাজ করে শব্দ বললো। এর পরই বালক ঐ যন্ত্রের আরো উন্নতি করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত করলো।

কে এই বালক? এই বালকই ভবিষ্যতের জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলভা এডিসন।

॥ ক্রেস্কোগ্রাফ ॥

বিংশ শতাব্দীতে অনেক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অনেক যন্ত্রেরই নাম হয়তো তোমরা শুনেছো। কিন্তু 'ক্রেস্কোগ্রাফ' নামক একটি যন্ত্রের নাম কি তোমরা শুনেছো—শোননি! অথচ শুনলে তোমরা আশ্চর্য হবে যে এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন আমাদের

দেশেরই একজন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। শুধু তাই নয়—এই যন্ত্রের মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন, মানুষের মত গাছেরাও প্রাণবন্ত—সুখে-দুঃখে অনুভূতিশীল। সে এক ইতিহাস—

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা বলতেন গাছপালা প্রাণবন্ত, জন্ম-মৃত্যু, বৃদ্ধি সবই তাদের আছে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা, ভারতের প্রাচীন মুনি-ঋষিদের কথার উপর বিশ্বাস করে, বরেণ্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, গাছপালা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে বললেন: গাছ-পালা শুধু প্রাণবন্তই নয়—এরাও প্রাণীদের মত উত্তেজনায় সাড়া দেয়।



জগদীশচন্দ্র বসু

এরাও সুখে, দুঃখে মানুষেরই মত অনুভূতিশীল—তখন জগদীশচন্দ্রের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাননি—চাননি দেশ-বিদেশের কোন বিজ্ঞানীই। অতঃপর জগদীশচন্দ্র আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানালেন যে, আমার এই আবিষ্কারের সত্যতা একটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দিতে পারি। এর পরই আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে বললেন: বেশ, আপনি আসুন, এসে আমাদের সামনে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিন।

এ সুযোগ হাতছাড়া করলেন না জগদীশচন্দ্র। তাঁর 'ক্রেস্‌কোগ্রাফ' যন্ত্রটি নিয়ে আমেরিকা রওনা হলেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে বিশ্বের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের বিরাট এক সমাবেশে ভারতের বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র তাঁর ক্রেস্‌কোগ্রাফ যন্ত্রটি নিয়ে যখন সুসজ্জিত এক হল ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সকলেই তাঁকে করতালি দ্বারা অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর উত্তরে তিনি বললেন: আজ আমি যে সত্যতা আপনাদের কাছে প্রমাণ করতে এসেছি, সেটা আমার একার নয়—ভারতের পূর্ব পুরুষ ও মুনি ঋষিরা বহু যুগ আগেই একথা বলে গিয়েছেন। আমি শুধু তাঁদেরই কথা বাস্তবে প্রমাণিত করতে চাই। এই কথা বলে তিনি তাঁর ক্রেস্‌কোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সকলের সামনে প্রমাণ করে দিলেন যে, গাছপালার শুধু প্রাণই নেই—আছে প্রাণীদের মতই উত্তেজনায় সাড়া দেবার অনুভূতি।

বিশ্বের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরা স্বচক্ষে এসব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং সকলেই তাঁর এই অভিনব যন্ত্র আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে এলেন।

জগদীশচন্দ্র ক্রেস্‌কোগ্রাফ ছাড়াও শব্দ তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত করার কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনিই প্রথম বলেছিলেন,—বিনা-তারেও সংবাদ প্রেরণ করা যায়।

॥ টেলিগ্রাফ ॥

মানুষ যা করবে বলে মনে মনে সংকল্প করে ও জীবনকে যে পথে চালাবে বলে ভেবে নেয়, হয়তো কোন এক আকস্মিক ঘটনায় অনেক সময় তার মনে এমন এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটে যে, তখন তার আর পূর্ব সংকল্পিত পথে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছে থাকে না। এক

অদৃশ্য হস্ত যেন তার জীবনকে ভিন্ন পথে চালিত করে নিয়ে যায়। ঠিক এমনটি ঘটেছিলো স্যামুয়েল মোর্সের জীবনে। শোন সেই গল্প :

মোর্স ছিলেন একজন চিত্রকর. ছবি আঁকতেই তিনি ভাল বাসতেন। একবার তিনি বিশ্বের সব বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রগুলি দেখার জন্যে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে চিত্রাদি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভ করে ১৮৩২ সালে দেশে ফেরার জন্যে লণ্ডন থেকে 'সালী' নামক একটি জাহাজে ওঠেন। সেই জাহাজে মোর্সের সঙ্গে আলাপ হয় ফরাসী ডাক্তার জ্যাকসনের সঙ্গে। ডাক্তার হলেও জ্যাকসনের ছিল বিদ্যুৎ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা। একদিন



স্যামুয়েল মোর্স

জাহাজেই জ্যাকসন, মোর্সকে বিদ্যুৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়ে বললেন, লোহার তারের ভিতর দিয়ে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করান যায় তাহলে ওই লোহা চুম্বকের কাজ করে।

মোর্স উৎসাহিত হয়ে বললেন, যদি তার লম্বা হয় ?

তাহলেও তাতে বিদ্যুৎ পরিব্যাপ্ত হতে বেশী সময় লাগবে না— বললেন ডাঃ জ্যাকসন।

মোর্স জ্যাকসনের উত্তর শুনে বেশ খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, তাহলে তো লম্বা তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করে একস্থান থেকে অন্য স্থানে খবর পাঠানো যাবে।

জ্যাক্‌সন বললেন, তা যেতে পারে, দেখুন না একবার চেষ্টা করে।

ব্যাস, আর যাবে কোথা। চিত্রকর এবার বৈজ্ঞানিক হতে চললেন, অর্থাৎ স্যামুয়েল মোর্স দেশে ফিরে তাঁর চিত্রশালাকে পরিণত করলেন গবেষণাগারে। বন্ধুবান্ধবেরা এসব কাণ্ড দেখে তো অবাক। সে কিরে, তুই শেষ পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ করে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে এলি। তবে কি তোর চিত্রাংকন করার ইচ্ছে আর নেই।

তার উত্তরে গম্ভীর হয়ে মোর্স বললেন, আমাকে বিরক্ত করিস না। আমি এখন বিজ্ঞানকে মানব কল্যানে নিয়োজিত করার জন্যে ব্যস্ত।

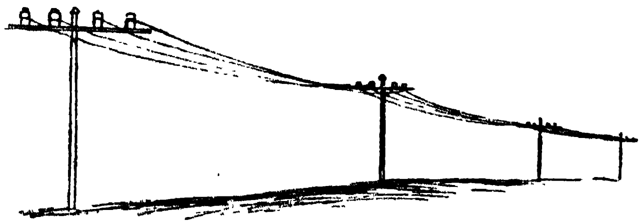
বন্ধুরা হাসলেন। করলেন ঠাট্টা-বিদ্রূপ। কিন্তু মোর্স সব উপেক্ষা করে গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন।

অচিরেই তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি কিনতে গিয়ে মোর্স প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থে টান পড়লো। তবু তিনি দমলেন না। নিজের হাতেই আবশ্যক যন্ত্রাদি তৈরী করতে লাগলেন। তিনি ঘোড়ার নালের আকারের একটি লোহার টুকরোকে তামার তার দিয়ে জড়িয়ে, তাকে সূতো দিয়ে বেশ করে মুড়ে সংযোগমুক্ত করে নিলেন। শুধু তাই নয়—তাঁর উদ্ভাবিত নতুন যন্ত্রের অন্যান্য অংশও নিজের হাতে তৈরী করে নিলেন। তারপর সাজ সারঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ পর পর সাজিয়ে খবর আদান-প্রদানের একটি যন্ত্র দাঁড় করালেন। এই যন্ত্রের নাম রাখলেন 'টেলিগ্রাফ'। মোর্স এই যন্ত্রের সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খবর পাঠালেন। কিন্তু তেমন খুশি হতে পারলেন না। কেননা এর সাহায্যে বেশি দূরে খবর পাঠানো সম্ভব হলো না। তাই তিনি এই অসুবিধা দূর করার জন্যে রীলে পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। ফলে তড়িৎপ্রবাহ

সেই "রীলের" চুম্বকের ভিতর দিয়ে গিয়ে খুব শক্তিমান হয়ে উঠলো। এতে দূরস্থানে খবর পাঠানোও সম্ভব হলো। স্যামুয়েল মোর্সের জীবনের মোড়ও ঘুরে গেলো। তাঁর স্বপ্ন এবার পুরোপুরি বাস্তবে রূপায়িত হলো।

তারপর ?

তারপর মোর্স টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকারের সমক্ষে তা প্রদর্শন করলেন এবং টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ১৮৪৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী মোর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে পার্লিয়ামেণ্ট ৩০ হাজার ডলার সাহায্য মঞ্জুর করলেন। এই সময় ভেল্ নামক এক বন্ধুও মোর্সকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন। এই সাহায্য পাওয়ার পর মোর্স ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত একটি টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করলেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে



যুক্তরাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর "ভগবানের দয়ায় সম্ভব হলো"—এই বার্তাটি প্রেরণ করে সাফল্য অর্জন করলেন। দিকে দিকে তার জয় ঘোষিত হলো। সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো। ছড়িয়ে পড়লো চিত্রকর হিসেবে নয়—একজন আবিষ্কারক হিসেবে। আজ স্যামুয়েল মোর্স নেই—কিন্তু তাঁর গবেষণা ও সাধনার ফল শুধু আমেরিকাবাসীই নয়—সারা বিশ্ব ভোগ করছে—করবে চিরকাল। তাইতো স্যামুয়েল মরেও অমর।

॥ টেলিফোন ॥

স্যামুয়েল মোর্স টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে মানুষের সুখ-দুঃখের বার্তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণে সাহায্য করলেন। ফলে মানুষের সংবাদ আদান প্রদানের সময় সংক্ষিপ্ত হলো। তবু মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারলো না। মানুষ এমন একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে ইচ্ছে করলেন—যা টেলিগ্রাফ যন্ত্রের অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর হবে। শুধু সংকেত প্রেরণ নয়—আমাদের সমস্ত কথাবার্তা, আমাদের কণ্ঠোচ্চারিত সমগ্র স্বরগ্রামের প্রতি পর্দা যেন



গ্রেহাম বেল

আমরা ইচ্ছে করলে দূরে পাঠাতে পারি—তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় মানুষ নিমগ্ন হলো। এবং তারই ফলে আমরা পেলাম টেলিফোন। গল্পটা এই রকম :

তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর। নাম গ্রেহাম বেল। বেল স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ষোল বছর বয়সেই বেল দেখেন যে, তখনকার দিনের কয়েক জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, টেলিগ্রাফের তারের উপর দিয়ে সঙ্গীতধ্বনি পাঠাবার চেষ্টা করছেন। এই ব্যাপারটা তিনি বেশ ভাল করে লক্ষ্য করলেন। শুধু তাই নয়,—বেল নিজেও এ ব্যাপারে গবেষণা করবেন বলে স্থির করলেন। সে সময়ে তিনি মূক-বধিরদের শিক্ষা দিতেন এবং বোষ্টনে একজন সমৃদ্ধশালী লোকের বাড়ীতে থেকেই তাঁর পুত্রকে পড়াতেন। সুতরাং তিনি পরীক্ষাগার হিসাবে সেই বাড়ীর নিচেকার একখানি ছোট ঘরও পেয়ে গেলেন। শুরু করলেন গবেষণা। তবে সঙ্গীত-ধ্বনী পাঠানোর পরিবর্তে তিনি টেলিগ্রাফ তারের মাধ্যমে দূরে কোনরূপ শব্দ পাঠানো যেতে পারে কিনা, সে বিষয়ে বৈদ্যুতিক ব্যাটারি ও টিউনিং ফর্ক নিয়ে নানারকম পরীক্ষাকার্য আরম্ভ করলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সংকেতের পরিবর্তে শব্দ পাঠানোর চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। এভাবে দীর্ঘ চার-পাঁচ বছর গবেষণা করার পর অবশেষে তিনি আংশিক সাফল্য লাভ করলেন। অর্থাৎ বেল কর্ণপটাহের অনুরূপ ছ'খানি লোহার পাতলা পাত তৈরী করে, ছ'খানিকে একটি বিদ্যুৎ পরিব্যাপ্ত তারের ছুই প্রান্তে সংযুক্ত করে দিলেন। এক প্রান্তে আঘাত করে অন্য প্রান্তে অনুরূপ শব্দের স্পন্দন তিনি শুনতে পেলেন। এমন কি, এই উপায়ে তিনি নিকটবর্তী জায়গায় মানুষের কণ্ঠধ্বনিও প্রেরণ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু তবু তিনি খুশী হতে পারলেন না। কেননা দূরবর্তী স্থানে মানুষের কণ্ঠধ্বনি প্রেরণ করতে হবে। সে উপায়ই তখন তিনি ভাবতে লাগলেন। তখন বেলের বয়েস মাত্র ২৬ বৎসর।

এবার গ্রেহাম বেল বোষ্টনে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে বিদ্যুৎ-সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন তাঁরই এক বন্ধু টমাস ওয়াটসন। পরীক্ষাকার্য ছাড়াও ওয়াটসন আর্থিক সাহায্য দিয়েও গ্রেহাম বেলকে সাহায্য করতে

লাগলেন। গবেষণা তখন পুরোদমে চলছে। সেটা ইংরেজী ১৮৭৬ সালের কথা। বেল ও ওয়াটসন তখন গবেষণা কাজে ভীষণ ব্যস্ত। বেল ছিলেন গবেষণাগারে, ওয়াটসন ছিলেন পাশের ঘরে। বেল ব্যাটারি সংলগ্ন তারের একটি প্রান্ত নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। অপর প্রান্তটি ছিলো পাশের ঘরে বন্ধু ওয়াটসনের কাছে। হঠাৎ বেল তার সংলগ্ন পাত থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। শব্দ শুনে বেল চমকে উঠলেন। সে মুহূর্ত মাত্র, তার পরই বেল আনন্দে চীৎকার করে বললেন,—বন্ধু ওয়াটসন, পাশের ঘর থেকে পূর্বে তুমি যে শব্দ করেছিলে অনুরূপ শব্দ করো। সত্যি কি আশ্চর্য! এবারে বেল অবিকল সেই শব্দটি শুনতে পেলেন। তারপর দু'জনের মধ্যে তারের মাধ্যমে চললো বাক্যালাপ। সেটা সম্ভবতঃ ১৮৭৬ সালের ১০ই মার্চ। বেল তারের এক প্রান্ত নিয়ে চলে গেলেন ছাদের উপর আর অপর প্রান্ত নিয়ে ওয়াটসন রইলেন নীচতলায়।



বেলই ছাদের উপর থেকে প্রথম কথা বললেন,—'বন্ধু ওয়াটসন, আর দেরী করো না, তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসো কাজ আছে।' —এক্ষুনি আসছি। বলে ওয়াটসন দ্রুতপদে বেলের নিকট ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমার সব কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি বেল। বেলও আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে ওয়াটসনকে

বললেন,—আমিও তোমার কথা শুনতে পেয়েছি ওয়াটসন। তারপর ?

তারপর আবিষ্কারের ইতিহাসে ১৮৭৬ সালের ১৩ই মার্চ দিনটি স্মরণীয় হয়ে রইলো—কেন না এই দিনই গ্রেহাম বেল শ্রান্তিহীন পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আবিষ্কার করলেন টেলিফোন যন্ত্র। আর পেলেন বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসাবাণী। যদিও এর পরও টেলিফোন যন্ত্রের উপকারিতা সম্বন্ধে মানুষকে বোঝাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল—এমন কি, অনেকে বাজে খেলনা বলে যে উপহাস করেছিলো, সে যন্ত্রই আজ দূরকে করেছে নিকট। শুধু তাই নয়—মানুষকে উন্নতি ও সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেও টেলিফোন যন্ত্র যথেষ্ট সহায়তা করেছে, এ কথা আজ আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

॥ বিজলী বাতি ॥

ফোনোগ্রাফ ও চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পর এডিসন 'বিজলী বাতি' আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, একটি ভোল্টাস সেল (Voltas cell) হতে যদি অধিক পরিমাণে তড়িৎ উৎপাদন করা যায় তাহলে তৎসংযুক্ত তারটি গরম হয়ে জ্বলে যায় এবং তারটি খুব তপ্ত হলে সুন্দর আলো হয়। এডিসন এই আলোক মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার গবেষণা শুরু করলেন। কিন্তু নানা বাধা এসে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলো। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, একটি ইলেকট্রিক সেল হতে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তার দ্বারা একটি লোহার তারকে অতিরিক্ত উত্তাপে উত্তপ্ত করলে তারটি গলে যায়। কারণ লোহার তারের উত্তাপ সইবার ক্ষমতা কম।

তখন তিনি উত্তাপ সইবার ক্ষমতা বেশি এমন একটি তারের সন্ধান করতে লাগলেন। সন্ধান করতে করতে এমন একটি তার

তিনি পেয়ে গেলেন যার গলিতাংশ (Melting point) লোহার চেয়ে বেশি, সহনক্ষমতাও যথেষ্ট। এর নাম প্লাটিনাম।

এডিসন পরীক্ষা করে দেখলেন, একটি প্লাটিনামের তারকে বায়ুশূন্য কাচের বালবের ভিতরে রেখে যদি ওই তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ আনা যায় তবে ওই তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তারটাও গলে যায় না।



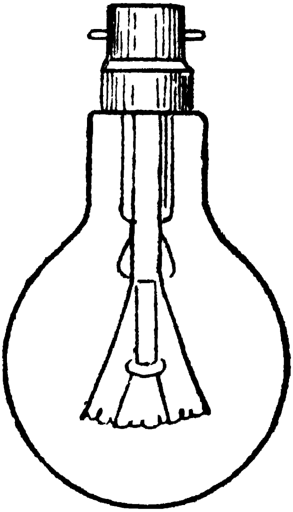
এডিসন

এছাড়া প্লাটিনামের আরো কয়েকটি গুণ তিনি লক্ষ্য করলেন, যেমন : প্লাটিনামের তারকে যখন কাচের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তখন কাচ ফেটে যায় না বা জোড়স্থানও আলগা হয় না। কেননা, প্লাটিনাম ও কাচ ঠাণ্ডা হলে সমমাত্রায় সংকুচিত হয়। এই পরীক্ষার পরই তিনি বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কার করলেন। কিন্তু এতে খরচ বেশি পড়ায় তিনি মূল্যবান ধাতু প্লাটিনামের বদলে অন্য তারের সন্ধান করতে লাগলেন।

শুরু হলো পরীক্ষা।

প্রথম প্রথম তিনি বাঁশ এবং অন্যান্য গাছের আঁশ নিয়ে পরীক্ষা করলেন। তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি বাঁশের পরিবর্তে সেলুলোজ দিয়ে তৈরী সুতো ব্যবহার করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন। মূল্যবান প্লাটিনাম ধাতুর আর

প্রয়োজন হলো না। সেলুলোজের সূতো দিয়েই বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো সম্ভব হলো। সহজ পন্থায় উৎপাদনের খরচও কম পড়লো।



সারা বিশ্ব বৈদ্যুতিক আলোক মালায় সজ্জিত হলো। সে সঙ্গে মহাবিজ্ঞানী হিসাবে এডিসনের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। সেটা ইংরেজী ১৮৭৯ সালের কথা।

শোনা যায়, এডিসন যখন বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন, তখন একদিন তাঁর এক বন্ধু বলেছিলো : এডিশন তুমি কেন মিছে সময় নষ্ট করছো। তোমার সময়ের কি কোন মূল্য নেই !

এডিসন তার উত্তরে বলেছিলেন, আমি অন্ধকার জগৎ থেকে মানুষকে আলোয় নিয়ে যেতে চাই, জানিনা সে প্রচেষ্টা আমার সফল হবে কি না।

এডিসন আজ নেই, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন তাঁর কীর্তি আজ গোটা বিশ্বের মানুষের ঘরে ঘরে। এখানেই তো তাঁর চরম সার্থকতা।

॥ এক্স-রে ॥

'এক্স-রে' আবিষ্কারের আগে মানুষের শরীরের ভেতরকার খবর সঠিকভাবে জানা যেতো না। কাজেই তখন আন্দাজের উপর চিকিৎসা করা হতো। ফলে প্রকৃত রোগ নির্ণয় করতে না পেরে ডাক্তারদের চিকিৎসা করতে যেমন বেগ পেতে হতো তেমনি অনেক রোগী ভুল চিকিৎসায় কষ্ট পেয়ে মারা যেতো। বিশেষ করে ক্ষয় রোগ আর হাড় ভাঙ্গা রোগীদের কষ্টের আর সীমা ছিলো না। পরবর্তীকালে মানুষ পেলো এক্স-রে। দূর হলো দুঃখ-কষ্ট। গল্পটা এই রকম :

জার্মাণীর এক অধ্যাপক। নাম তাঁর রণ্টজেন। এই রণ্টজেন সাহেব প্রায়ই বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে গবেষণা করতেন। একদিন তিনি বায়ুশূন্য কাচের টিউবের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করছিলেন। সেই সময় নানা রঙের আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছিলো।

পাশেই ছিলো একটি কাঠের বাক্স। অধ্যাপক তাতে কয়েক-খানা ফটো প্লেট রেখে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন বস্তুর ছায়াছবি তোলাও ছিলো তাঁর বাতিক। পরীক্ষা শেষ করে, তিনি বাক্স খুলে অবাক হয়ে গেলেন। কাঠের বাক্সের ভিতরে রাখা সমস্ত প্লেটগুলো ঝলসে গেছে। গেছে নষ্ট হ'য়ে।

বিস্মিত রণ্টজেন সাহেব ভাবতে লাগলেন : কেমন করে ফটো প্লেটগুলো নষ্ট হয় গেলো ! তবে কি বিচ্ছুরিত নানা রঙের আলোই এর জন্যে দায়ী।

শুরু করলেন। হ্যাঁ, তিনি যা ভেবেছিলের ঠিক তাই। পরীক্ষা করে তিনি জানতে পারলেন, কাচের টিউবের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালনা করার সময় যে নানা রঙের আলো বিচ্ছুরিত

হচ্ছিলো তা' কাঠ বা যে কোন অস্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে। আর এই কারণেই বাক্সের ভিতরে রাখা প্লেটগুলো ঝলসে গেছে।

এতেও তিনি খুশী হতে পারলেন না। তিনি পুনরায় ওই বিচ্ছুরিত আলোর ক্ষমতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করার জন্যে একটি মোটা বইয়ের ভিতরে একটি লোহার চাবি রেখে তার পাশ দিয়ে ওইভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলেন। কাচের নলের ভিতর দিয়ে প্রবাহ চলতে শুরু করা মাত্র তা থেকে বিভিন্ন আলোর স্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগলো। রণ্টজেন সাহেব এই আলোতে ফটো তোলার ব্যবস্থা করলেন।

ফটো উঠলো! হ্যাঁ, সত্যি সত্যি বইয়ের ভিতরে রাখা চাবির অনুরূপ ছাপ উঠে গেলো। এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না রণ্টজেন সাহেব—অধীর আনন্দে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। তবে ওই আলো যে কি জিনিস তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। তাই তিনি ওর নাম দিলেন 'নাম-না-জানা-রশ্মি' বা 'এক্স-রে'।

তারপর ?

তারপর এই রশ্মি চিকিৎসা জগতে যুগান্তর নিয়ে এলো, আর রণ্টজেন সাহেবের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

॥ বেতার যন্ত্র ॥

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর আবিষ্কৃত 'ক্রেসকোগ্রাফ' যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন গাছপালা দুঃখে, সুখে প্রাণীদেরই মত অনুভূতিশীল এবং তারাও উত্তেজনায় সাড়া দেয়। এ ছাড়া তিনি আরো একটি জিনিষ আবিষ্কার করেছিলেন। সেটি হচ্ছে শব্দ তরঙ্গকে বিদ্যুৎতরঙ্গে পরিণত করার কৌশল। জগদীশচন্দ্রই প্রথম বলেছিলেন যে—তারেও সংবাদ পাঠানো যায়।

ইংরেজী ১৮৯৫ সালে কোলকাতায় টাউনহলে ছোটলাটের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিলো। জগদীশচন্দ্র ওই সভায় শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎতরঙ্গে পরিণত করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে বিনা তারেও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খুব সহজে সংবাদ পাঠানো যায়। বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের ওই মূলসূত্র জানতে পেরেও তিনি এর কোন পেটেন্ট নেননি বা পরবর্তীকালে আর এই সম্বন্ধে অগ্রসর হননি। যার ফলে তিনি এই বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের স্বীকৃতি পাননি—পেয়েছিলেন বিজ্ঞানী মার্কণী।

ইংরেজী ১৮৭৪ সালে ইটালীতে মার্কণীর জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই মার্কণী নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন। তাঁর জন্মের ৩৯ বছর আগে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৩৫ সালে স্যামুয়েল মোর্স আবিষ্কার করেছিলেন টেলিগ্রাফ যন্ত্র। আর তাঁর জন্মাবার দু'বছর পর অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৭৬ সালে আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল আবিষ্কার করেছিলেন 'টেলিফোন যন্ত্র'। তিনি যখন স্কুলে পড়েন তখন থেকেই টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন যন্ত্র তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। অবসর সময়ে তিনি কেবল ভাবতেন, যদি তারের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে প্রবাহিত ক'রে একস্থান থেকে অন্য স্থানে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায় ও কথাবার্তা বলা যায়—তবে বিনা তারেই বা খবর পাঠানো যাবে না কেন? এই প্রশ্ন বার বার তাঁর মনে ধাক্কা দিতে লাগলো! তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

শুরু করলেন গবেষণা।

মার্কণী তাঁর নিজস্ব গবেষণাগারে নানারকম যন্ত্রপাতি জোগাড় করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন। সেই সঙ্গে পড়াশুনা। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে যাবার পরও বিনা-তারে সংকেত পাঠানোর কোন সূত্রই তিনি খুঁজে পেলেন না। তাই বলে তিনি মুষড়েও পড়লেন না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই সময় জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্ৎস আবিষ্কার করলেন যে,

ইথার-মণ্ডলে বিদ্যুৎ বৃত্তের আকারে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে জলে যেমন গোলাকার তরঙ্গের সৃষ্টি করে—ঠিক তেমনি।

হার্ৎসের এই আবিষ্কার মার্কণীর জীবনে এক চরম সন্ধিক্ষণ ডেকে নিয়ে এলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, ইথারে যদি বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে, তবে শব্দ তরঙ্গ কেন বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে প্রবাহিত হবে না। নিশ্চয়ই হবে। এই ধারণা পোষণ করে তিনি এক চরম পরীক্ষায় মেতে উঠলেন। যন্ত্রপাতি কিছু অদল-বদল করে এবং মাসের পর মাস নিয়মিত সাধনা ও পরিশ্রম করে অবশেষে তিনি সাফল্যলাভ করলেন—তিন হাজার মাইল দূর থেকে পাঠানো সংকেত বেতার যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার শুনতে পেলেন।

ইংরেজী ১৮৯৬ সালের সেই বিশেষ দিনটি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে—যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, বিশ্বের কনিষ্ঠতম বিজ্ঞানী মাত্র বাইশ বছর বয়সে রিসিভারটা কানে লাগিয়ে একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করছেন অধীর আগ্রহে। আর ভাবছেন, এই বুঝি সংকেতটা এসে কানে বাজে।

হ্যাঁ, সত্যি এলো সেই সংকেতধ্বনি। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে দক্ষিণ কর্ণওয়াল থেকে তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে সেণ্ট জোন্সে এসে সে সংকেতধ্বনি তাঁর কানে বাজলো। মার্কণী স্পষ্ট অথচ পরিষ্কার শুনতে পেলেন সে বার্তা—টক্কা! টক্কা! টক্কা!

মার্কণী হঠাৎ তাঁর সেই বিশেষ শব্দটি শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর সহকারী কেম্পের হাতে রিসিভারটা তুলে দিয়ে বললেন, "দেখ দেখি কেম্প, কিছু শুনতে পাও কিনা!"

কেম্প তাঁর হাত থেকে পরিগ্রাহকটি নিয়ে কিছু শুনতে চেষ্টা করলেন এবং অচিরে আনন্দে অধীর হয়ে মার্কণীকে বললেন: তিনি খুব স্পষ্ট তিনটি টক্কা-টক্কা-টক্কা, শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এবার আর কোন সন্দেহ রইলো না মার্কণীর। উদ্ভাসিত আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে

সহকর্মীকে বললেন : "কেমন, দক্ষিণ কর্ণওয়াল থেকে বিনা তার-এ যে সংকেতধ্বনি পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসেছিলাম তা আজ আমি পেয়েছি" বলে তিনি তাঁর চরম সাফল্যে সহর্মীকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর ?

তারপর বিনা-তারে সংবাদ প্রেরণের উদ্‌ভাবন কর্তা হিসাবে মার্কণীর নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। বিশ্বের নানা জায়গা থেকে অভিনন্দনসূচক অসংখ্য প্রশংসাপত্র তাঁকে যেন ছেঁকে ধরলো। সংবাদপত্র থেকে এ সম্বন্ধে পাঠানোর তাগিদ আসতে লাগলো। চতুর্দিকে যেন মার্কণীকে নিয়ে বিরাট একটা হৈ চৈ পড়ে গেলো। জানা যায়, তিনি যখন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ছাড়লেন—তখন পথে তাঁর ট্রেন যে যে স্টেশনে দাঁড়িয়েছিলো, প্রত্যেক স্টেশনেই হাজার হাজার লোক এই বিনা-তারে সংবাদ প্রেরণ-কর্তাকে দেখার জন্যে সমবেত হয়ে জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিলো!

॥ ফটোগ্রাফ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকরা কতকগুলো রসায়নিক বস্তুর উপর সূর্যরশ্মির প্রতিক্রিয়া কি রকম হয় তা' জানবার জন্যে গবেষণা আরম্ভ করেন।

তোমরা বোধহয় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার হামফ্রে ডেভির নাম শুনেছো। তিনিই সর্বপ্রথম দেখতে পেলেন যে, সাদা কাগজ সিলভার নাইট্রেটে ডুবিয়ে—তার উপর কোন বস্তুর ছায়াপাত করলে, সেই ছায়াটি কিছুক্ষণের জন্য সেই কাগজের উপর আঁকা হয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণ পর মিলিয়ে যায়। বহু চেষ্টা করলেন ডেভি স্থায়ী ভাবে ছায়াটিকে কাগজের উপর ধরে রাখতে; কিন্তু পারলেন না। কিন্তু তিনজন ফরাসী এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করলেন। তাঁরা

হলেন যথাক্রমে নিপস ভ্রাতৃদ্বয় ও লুই জ্যাক। রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত কোন বস্তুর উপরে ছায়াছবি গ্রহণ করে, তাকে স্থায়ীভাবে অংকিত করে নিতে এরাই প্রথম সফল হন।

নিপস ভ্রাতা একদিন একটি ছবি এঁকে তার উল্টো পিঠ ভাল করে বার্ণিস করে তাকে বেশ স্বচ্ছ করে তুললেন। তারপর ধাতু নির্মিত একটি পাতের উপর বিটুমেনের প্রলেপ দিয়ে তার উপর ছবিখানা রেখে সূর্যালোকে ধরলেন। দেখা গেলো, ছবির যে অংশ হালকা ও পাতলা ছিলো। তার মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে নীচের ধাতুপাতে অবিকল সেই অংশগুলি এঁকে দিয়েছে। শুধু তাই নয়—ওরা ওই অংকিত ছবির অংশটিকে পাতের উপর স্থায়ীভাবে ধরে রাখতেও সমর্থ হলেন। সিলভার নাইট্রেটের পরিবর্তে ল্যাভেণ্ডার এসেন্স ব্যবহার করে এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করলেন। কিন্তু ওই উপায়ে মানুষের ছবি ওরা ধরে রাখতে পারলেন না। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইংরেজী ১৮২৫ সালে নিপসভ্রাতা মানুষের ফটো তুলতেও সক্ষম হন।

এই সময় লুই জ্যাকও ফটো তোলবার কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করছিলেন। নিপসের কৃতকার্যতার খবর পেয়ে লুই ওদের সঙ্গে দেখা করে বন্ধুত্ব পাতালেন এবং তিনজনে মিলে আলোকচিত্র-শিল্পের উন্নতি বিধানে চেষ্টা করতে লাগলেন।

ওরা বিটুমেনের পরিবর্তে সিলভার প্লেটে আয়োডিনের প্রলেপ দিয়ে আরো ভালো ফল পেলেন। কিন্তু ছবিগুলোর ঝাপসা বা অপরিষ্কার ভাবটা সম্পূর্ণ কাটলো না। চেষ্টার কোন ত্রুটি করলো না ওরা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবি পাওয়ার জন্যে। সব চেষ্টাই ওদের বিফল হলো।

একদিন লুই জ্যাক রাত্রে অসতর্ক মুহূর্তে কয়েকটি কাঁচা 'সিলভার প্লেট' একটি পাত্রে রেখে শুতে চলে যান। পরদিন সকালে প্লেটগুলো বার করতে গিয়ে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। দেখেন, প্লেটের উপর পরিষ্কার ছবি আঁকা হয়ে রয়েছে।

এটা কেমন করে সম্ভব হলো! কঠোর পরিশ্রম করে এদ্দিন ওরা যা পারেনি। হঠাৎ আকস্মিকভাবে ওই অসম্ভব সম্ভব হলো কেমন করে?

অবশেষে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, ওই পাত্রে ছিলো পারা। পারাই ওই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়েছে।

এভাবে বিজ্ঞানের অন্যান্য আবিষ্কারের মত ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র-শিল্পেরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। দেশ-বিদেশে নিপসও লুই জ্যাকের নাম ছড়িয়ে পড়লো।

এখন ক্যামেরা ও ফিল্ম্ তৈরী হওয়ার ফলে এ শিল্প দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে—যে কোন ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছে।

॥ চলচ্চিত্র ॥

একটা কার্ডবোডের একটা পাখি, অন্যদিকে একটা শূন্য খাঁচা আঁকো। কার্ডবোর্ডের দু'দিকে দুটো সুতো বেঁধে সুতো দুটো টান টান করে ধরে কার্টবোর্ডটাকে ঘোরাও—দেখবে খাঁচার মধ্যে পাখিটা বসে রয়েছে। এটা হলো চোখের ধাঁধা।

এককালে বিলাতে এই ধরনের খেলনা তৈরী করে বিক্রী করা হোত। এর নাম ছিলো 'Thaumatrohe'। এটি একটি গ্রীক শব্দ—যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'বিস্ময় চক্র'।

এ দেখে কেউ কেউ ভাবলে, পরপর কতকগুলি ছবি কায়দা করে সাজিয়ে যদি চোখের সামনে ঘোরানো যায়, তাহলে হয়তো মনে হবে ছবি নড়ছে। এই কথা ভেবে বিজ্ঞানী হর্ণার ইংরেজী ১৮৩৩ সালে একটি খেলনা তৈরী করলেন, তার নাম দিলেন 'Zeotrohe' অর্থাৎ 'জীবন-চক্র'। তিনি এই খেলনার মাধ্যমে দেখাতেন একটি ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। এমনি আরো অনেকেই এ ধরণের খেলনা তৈরী করে মৃত ছবিকে জীবন্ত করার চেষ্টা করলেন।

১৮৬০ সাল। মার্কিন বিজ্ঞানী সেলার্স একদিন তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন,—তোমরা একটা কিছু করছো, আমি এই রকম ছবি তুলবো। ছেলেরা কি কাজ করবে? ঠিক হলো পেরেক ঠুকবে। বেশ, ছেলেরা পেরেক ঠোকার বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়ালো, আর সেলার্স ক্যামেরার সাহায্যে এক একটি ছবি তুলতে লাগলেন। ফটো তোলা শেষ হলে একটি চাকার গায়ে এই ফটোগুলি পরস্পর বসিয়ে দিলেন। চাকাটি ঘোরাতেই মনে হলো— ছবি যেন সচল হয়ে উঠেছে। সেলার্স এই যন্ত্রটির নাম দিলেন 'কিনে ম্যাটোস্কোপ' এবং পেটেন্ট নিলেন ১৮৬১ সালে।

১৮৭৭ সালে বিজ্ঞানী মায়ব্রিজ ধাবমান অশ্বের বিভিন্ন অবস্থার ফটো তোলবার একটি অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করেন। পাশাপাশি অনেকগুলি ক্যামেরা স্থাপন করে—এমন যান্ত্রিক ব্যবস্থা করা হলো যাতে ঘোড়াটি যখন যে ক্যামেরার সামনে পৌঁছুবে—আপনা থেকে তার সাটার খুলে আবার তখনই বন্ধ হয়ে যাবে—তেমনি পর পর বিভিন্ন অবস্থার ফটো উঠে যাবে আপনা থেকে। এর জন্যে ১৮৮৩ সালে প্যারিসে একটি স্টুডিও খোলা হলো—নানারকম জীবজন্তুর সচল ছবি দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এদিকে বিজ্ঞানের যাদুকর টমাস আল্‌ভা এডিসন এসব দেখে ক্রমশই চলচ্চিত্র সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত যন্ত্র 'ফেনোগ্রাফ' নিয়ে গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ তার মনে হলো, ফোনোগ্রাফের সিলিণ্ডারের গায়ে ছবিগুলি বসিয়ে ঘোরালে হয়তো আরো ভাল ফল পাওয়া যাবে। তিনি ছোট ছোট অনেকগুলি ফটো তুলে সেগুলি পর পর সেঁটে দিলেন সিলিণ্ডারের গায়ে। আর ছবি দেখবার ব্যবস্থা করলেন একটি শক্তিশালী লেন্সের ভিতর দিয়ে। হাতল ঘোরাতেই একটার পর একটা ছবি লেন্সের সামনে আসে। তাতে ছবি যেন সচল হয়ে উঠে। এতে আগের চেয়ে আরো ভাল ফল পাওয়া গেল—তবু এডিসন খুশী হতে পারলেন না।

এরপর এডিসন সেলুলয়েডের লম্বা ফিল্মে পরপর কতকগুলি ছবি তুললেন। তারপর একটি যন্ত্র তৈরী করলেন। তার ভিতর দিয়ে এই ফিল্ম পাঠালেন। এবং জোরালো আলোর সাহায্যে তা আলোকিত করলেন। একটি বড় লেন্সের সাহায্যে সেই ছবি প্রোজেক্ট করে ফেললেন পর্দার উপর। এবারে ফল আরো চমৎকার হল। এডিসন এই যন্ত্রটির নাম দিলেন 'কিনেটোস্কোপ'। সেটা ১৮৯৩ সালের কথা।

এডিসনের ফিল্মের দৈর্ঘ্য ছিলো মাত্র পঞ্চাশ ফুট—তেরো সেকেণ্ডেই ছবি শেষ। হোক, তবু এ থেকেই পাওয়া গেলো চিত্রের প্রকৃত আনন্দ। কালক্রমে ফিল্মের দৈর্ঘ্য বাড়ানো হলো—মানুষ পেলো আরো আনন্দ – পেলো জ্ঞান।

॥ টেলিভিশন ॥

ক্যামেরা, চলচিত্র, রেডিও প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জিনিসের মত টেলিভিশনও কেবল মাত্র একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্বের জন্যই বর্তমান রূপ পায়নি। একজন এর মূলনীতি আবিষ্কার করেছেন—তারই উপর গবেষণা করে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। তবে একটা জিনিসের মূল সূত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব যে বিজ্ঞানীর সাধারণত তাঁকেই সেই জিনিসের আবিষ্কারক বলে মেনে নেওয়া হয়। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এই গৌরব দেওয়া হয় স্কটল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী জন লোগী বেয়ার্ডকে।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেয়ার্ড একটি বৈদ্যুতিক কারখানায় চাকরি নিলেন। সেটা সম্ভবত ১৯২১ সালের কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতির জন্যে তিনি বেশীদিন চাকরি করতে পারলেন না। তাই তিনি বাড়ীতে বসেই কিছু কিছু গবেষণা করবেন বলে স্থির করলেন।

তখন বেতারের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছবি পাঠাবার জন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী চেষ্টা করছিলেন। এই বিষয়ে জার্মেনির ওয়েলার ও নিপ্‌কো ও ইংলণ্ডের সুইণ্টন অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। এঁদের অসমাপ্ত কাজের সূত্র ধরে বেয়ার্ড নতুন করে সুরু করলেন তাঁর পরীক্ষা। অটুট আত্মবিশ্বাস ও প্রচণ্ড অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে সত্যি তিনি সাফল্য লাভ করলেন। পাশের ঘরের পর্দায় ফুটে উঠলো গবেষণাগারে স্থাপিত একটি বস্তুর প্রতিচ্ছবি। কিছুটা অস্বচ্ছ, কিন্তু ছবির প্রান্তগুলি স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত।

বেয়ার্ড এতেও খুশী হতে না পেরে প্রতিফলিত ছবিটি আরো উন্নত করার জন্যে গবেষণা চালাতে লাগলেন। দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে অবশেষে তিনি সফল হলেন। স্থির বস্তু থেকে বেশ কিছু দূরে পর্দায় ফুটে উঠল তার ছবি—পরিষ্কার, স্বাভাবিক।

এই সময়কার একটি মজার ঘটনার কথা বেয়ার্ড নিজেই উল্লেখ করেছেন।

ঘটনাটা এই রকম :

গবেষণাগারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মানুষের ছবি পাশের ঘরে পর্দায় ফুটে উঠে কিনা, তা দেখবার জন্যে একজন লোকের প্রয়োজন। সে সময় গবেষণাগারে আর কেউ ছিলো না। বেয়ার্ড তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন। এসে সামনে দেখতে পেলেন এক ছোকরাকে —চায়ের দোকানের কর্মচারী। অনেক বুঝিয়ে বেয়ার্ড তাকে গবেষণাগারে নিয়ে এলেন। যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড় করিয়ে বেয়ার্ড ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। কিন্তু একি! পর্দায় মানুষের ছবি তো দূরের কথা—একটি আচড়ও পড়েনি। বেয়ার্ড হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। তবে কি এতদিনের পরিশ্রম তার বৃথা হয়ে গেলো। বিষণ্ণ চিত্তে বেয়ার্ড গবেষণাগারে ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, গবেষণাগারের বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতির ভয়ে ছোকরা যথাস্থান থেকে সরে এসে দরজার কোণে লুকিয়ে আছে। আর একটু দেরী হলে ছেলেটি পালিয়ে যেতো। বেয়ার্ড তাকে অনেক

করে বোঝালেন. কিন্তু কিছুতেই সে বিদঘুটে যন্ত্রের সামনে দাড়াতে চাইল না। শেষ পর্যন্ত তাকে মোটা টাকার লোভ দেখাতে সে রাজী হলো—তার ছবি তুলতে দিতে। পরবর্তীকালে বেয়ার্ড এক জায়গায় লিখেছিলেন, পৃথিবীতে প্রথম যার ছবি টেলিভিশনে পাঠানো হয়েছিলো—স্বেচ্ছায় সে আসেনি, মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তাকে রাজী করানো হয়েছিলো। এটা ১৯২৪ সালের কথা।

এর পরের ইতিহাস বেয়ার্ডের গৌরবের ইতিহাস। সারা পৃথিবীতে বেয়ার্ডের তখন জয় জয় কার। তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিতেই বিলাতে প্রথম নিয়মিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার স্থরু হয়—১৯৩৬ সালে। ১৯৪১ সালে বেয়ার্ড টেলিভিশনে রঙীন ছবি প্রেরণেও সাফল্য অর্জন করলেন।

॥ লৌহ ধাতু ॥

মতভেদ থাকলেও, ব্রোঞ্জযুগের পর থেকেই যে লৌহযুগ আরম্ভ হয়েছে, এ বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীরা সকলেই একমত। প্রাচীন যুগে ধাতুর ক্রমবিকাশের এমনি ইতিহাসই পাওয়া যায়। পাওয়া যায় কতকগুলি প্রাচীন নিদর্শন থেকে। পরিবর্তনের এই স্তরগুলি, যেমন: পাথর থেকে তামা—তামা থেকে ব্রোঞ্জ—ব্রোঞ্জ থেকে লোহা—যা মানুষ অতিক্রম করেছে ধীরে ধীরে—এই সমস্ত যুগের কালগুলি এখনো সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

সে যা হোক, ইতিহাসে ব্রোঞ্জযুগের পর লৌহযুগের সূচনা সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ গল্পের কথা শোনা যায়।

গল্পটা এই রকম:

তখন বুনো পাহাড়ী আদিম মানুষেরা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে বাস করতো। তারা হিংস্রপ্রাণী ও শীতের কনকনে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে শুকনো কাঠ, পাতা জড়ো করে বনে জঙ্গলে কিংবা

পাহাড়ে আগুন জ্বালতো। আর তার পাশে বসে ওরা শরীরকে উষ্ণ রাখতো এবং প্রচণ্ড অগ্নিশিখার দাপটে হিংস্র প্রাণীরাও পালিয়ে চলে যেতো দূরে।

তেমনি একদিন একদল বুনো মানুষ পাহাড়ে আগুন জ্বেলেছিলো। ওরা কি জানতো, সে পাহাড়টিতে ছিলো প্রচুর লৌহ আকর (Iron ore)? জানতো না। অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। শিখার প্রচণ্ড উত্তাপে মাটি সংলগ্ন লৌহ আকরগুলি গলে কয়েকটি তালে পরিণত হলো। এক সময় শিখা স্তিমিত হয়ে এলো—আগুনও নিভে গেলো। কিন্তু ওকি! ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলো, ছাইয়ের মধ্যে কয়েক তাল অজানা ধাতু।

বার বার কয়েকবার সেই অজানা ধাতুর শক্ত তালগুলি ওরা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো। নাঃ বেশ শক্ত মনে হচ্ছে। দেখাই যাক্ না পরীক্ষা করে। বলে ওরা তালটিকে পাথরের উপর রেখে পাথর দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। এভাবে ক্রমাগত আঘাতের পরও বস্তুটির যখন দৈহিক এতটুকু পরিবর্তন হলো না—তখন ওরা মনে করলো, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন শক্তিশালী ধাতু লুকিয়ে আছে—যা ব্রোঞ্জের চেয়ে কঠিন ও অনেক বেশী উপযোগী।

তারপর?

তারপর নিশ্চয়ই কোন অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিমান মানুষের চোখে এটা পড়ে থাকবে। হয়তো তারই একান্ত চেষ্টায় খনিজ সম্পদ হতে প্রথম লৌহ নিষ্কাশিত হয়েছিল—হয়েছিল লৌহযুগের শুভ সূচনা।

আজ আর লৌহ ধাতু সম্পর্কে নতুন করে তোমাদের বলার কিছুই নেই। এক কথায় বর্তমান সভ্যজগতের কর্মচাঞ্চল্য-এর মূলে রয়েছে এই লৌহ—যার ব্যবহার দিকে দিকে—চতুর্দ্দিকে।

॥ এলুমিনিয়াম ॥

এলুমিনিয়াম। আধুনিক বিজ্ঞানজগতে এর দান অপরিসীম। পৃথিবীতে যেসব ধাতু প্রতি মুহূর্তে মানুষের প্রয়োজনে লাগছে—এলুমিনিয়াম তাদের মধ্যে অন্যতম। ইংরেজী ১৮২৭ সালে বৈজ্ঞানিক উলার (Wohler) এলুমিনিয়ামের ক্লোরাইডকে পটাশিয়ামের সাহায্যে বিজারিত করে তিনি পেলেন এ যুগের সর্বাধিক ব্যবহৃত ধাতুর সন্ধান। এরপর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক চার্লস মার্টিন হল গলিত এলুমিনিয়ামের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চালিয়ে ব্যাপকভাবে এ ধাতু তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ফলে, এ ধাতুর ব্যবহারিক মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই বছর অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে বৈজ্ঞানিক হেঁরোও একই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কিন্তু অক্লান্ত গবেষণা করেও কোন রসায়ণবিদ মাটি থেকে এলুমিনিয়াম নিষ্কাশনে সক্ষম হননি। মাটিই এর অন্যতম উপাদান। মাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে অপর্যাপ্ত এলুমিনিয়াম। কিন্তু এই এলুমিনিয়াম সংগ্রহ করা সহজ নয়। বেশ কঠিন।

অনেক—অনেকদিন আগের কথা। প্রায় ১২০ বছর আগে দিনেমার একজন রসায়ণবিদ কাদা থেকে সামান্য এলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর থেকে বিজ্ঞানীদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং তাঁরা প্রকৃতি থেকে এ ধাতু নিষ্কাশনের চেষ্টা করতে থাকেন। প্রকৃতিতে এ ধাতু প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। তবে এর নিষ্কাশন বড্ড কষ্টসাধ্য। সাধারণতঃ বক্সাইট ওর (Ore) হতে ইলেকট্রো থারমাল প্রণালীতে (Electro-thermal process) এ ধাতু তৈরী করা হয়। সাধারণ সকল ধাতুর মধ্যে এলুমিনিয়াম সর্বাপেক্ষা হাল্কা।

এ ধাতু লোহার চেয়ে অনেক হাল্কা হলেও, মনে করো না এর ক্ষমতা কম। আসলে কিন্তু তা মোটেই নয়! এ ধাতু অত্যন্ত

দৃঢ় এবং ঘাতসহ। আর ক্ষমতার দিক দিয়ে বিচার করলে এ ধাতু লোহাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। সেইজন্যেই সারা বিশ্বে এর চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। চাষের যন্ত্রপাতি, যানবাহনে, বস্ত্রশিল্পে, রং তৈরিতে, বাড়ী তৈরী ও সাংসারিক দৈনন্দিন প্রয়োজনায় বাসনকোশন তৈরী ইত্যাদিতে এর ব্যবহার অতুলনীয়। শুধু তাই নয়—এর পাত প্রায় আনুমানিক ৫০০ শত কাজে ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিকরা এ ধাতু দিয়ে বাড়ীর দেওয়াল তৈরী করেছেন। কোন রংয়ের প্রয়োজন হয় না এতে। কেননা এর উপরিভাগ উজ্জ্বল বলে এর উপর মরচে পড়ে না। আওয়ার ড্যাভেন পোর্ট-এ এলুমিনিয়ামে তৈরী একটি সাড়ে চারতলা বাড়ী তৈরী হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে এই ধাতুরই সাহায্যে তৈরী হয় 'ওয়াশিংটন স্মৃতি সৌধ', কিন্তু পঞ্চান্ন বছর পরেও আজো তার উজ্জ্বল দ্যুতি অম্লান। তাহলে ভেবে দেখো এর ক্ষমতা বা গুণ কতটুকু।

সারা বিশ্বে পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন, 'ইউরেনিয়াম' রাখার উপযুক্ত পাত্রের জন্য। চললো বিভিন্ন ধাতু নিয়ে গবেষণা। অনেক গবেষণার পর এলুমিনিয়ামই পেলো জয়ের মাল্য।

॥ টাইটেনিয়াম ধাতু

গ্রীক পুরাণে সর্বংসহা ধরিত্রীর সন্তান বলে একদল দৈত্য বর্ণিত আছে। তাদের নাম টাইটান। তাই থেকে টাইটেনিয়াম নামের উৎপত্তি। ফরাসী বিপ্লবের বছরে ইংরেজী ১৭৮৯ সালে—এক ইংরেজ ধর্মযাজক উইলিয়ম গ্রেসর অবসর সময়ে রাসায়নিক গবেষণা ক'রে এই মৌলিকের প্রথম সন্ধান পান। যে কৃষ্ণ খনিজ নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন—তাঁর কর্মস্থানের কাছাকাছি মেনাচান উপত্যকা থেকে তা কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিলো। আর এজন্যেই

নতুন মৌলিকের নাম প্রস্তাব করেন তিনি 'মেনাচিন'। এর ছয় বছর পরে জার্মান বৈজ্ঞানিক ক্লাপরথ হাঙ্গেরি দেশ থেকে আনানো রুটাইল নামে খনিজের মধ্যে অনুরূপ মৌলিক আছে বলে প্রমাণ দেখান। এর নতুন নাম প্রস্তাব করেন তিনি 'টাইটেনিয়াম'। ক্লাপরথের কার্যবিবরণ অনেক সুসম্পূর্ণ ছিলো - সম্ভবতঃ সেই কারণে ভবিষ্যতে 'টাইটেনিয়াম' নামটি বিজ্ঞানসমাজে প্রচলিত হয়।

এঁরা কেউই মৌলিক অবস্থায় টাইটেনিয়াম ধাতু তৈরী করেননি। পরে অনেকে সেই চেষ্টা করেও বিফল হন। আবার কেউ কেউ বা টাইটেনিয়ামের কোন যৌগিককেই ধাতু বলে ভুল করেন। কারণ কি জানো ? কারণ, বেশী উত্তপ্ত অবস্থায় এ ধাতু সহজে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ইত্যাদি আশপাশের বস্তুদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চক্‌চকে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে।

সর্বপ্রথম টাইটেনিয়াম ধাতু ল্যাবরেটরিতে তৈরী হয়, ইংরেজী ১৯১০ সালে। এই সালে মিঃ হান্টার সোডিয়াম ধাতুর সঙ্গে টাইটেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডের ক্রিয়া ঘটিয়ে এই ধাতু প্রথম তৈরী করেন। বন্ধ পাত্রে দুই বস্তুর মিশ্রণকে গরম করলে সোডিয়াম ধাতু সোডিয়াম ক্লোরাইড বা নুনে পরিণত হয় এবং টাইটেনিয়াম ধাতু আলাদা হয়ে যায়। এই বিস্মৃত প্রায় গবেষণার ত্রিশ বছর পর, জার্মান বিজ্ঞানী 'ক্রোল' অত্যাচারের ভয়ে জার্মেনী থেকে পালিয়ে এসে, আমেরিকায় টাইটেনিয়াম ধাতু প্রস্তুত করার নতুন পদ্ধতির পেটেন্ট করেন। ইস্‌পাতের ঢাকা পাত্রের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু গলিয়ে তার মধ্যে টাইটেনিয়াম ক্লোরাইড ঢেলে দিলে অনুরূপ ক্রিয়া ঘটে এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও টাইটেনিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। পাত্রের মধ্যে বাতাসের বদলে অর্গান অথবা হিলিয়াম গ্যাস চালিয়ে তপ্ত টাইটেনিয়াম ধাতুকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংযোগ থেকে রক্ষা করা হয়। পাত্র ঠাণ্ডা করে উৎপন্ন বস্তুকে অ্যাসিডে গলালে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড এবং অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম ধাতু সলিউসনে যায় এবং ঝামার

মত ফোঁপড়া টাইটেনিয়াম 'স্পঞ্জ' পড়ে থাকে। 'স্পঞ্জ'কে এখন দ্বিতীয়বার আর্গন বা হিলিয়াম পূর্ণ পাত্রে গরম করে গলালে নিরেট ধাতু পাওয়া যায়।

টাইটেনিয়াম ধাতুকে এ যুগের আশ্চর্য ধাতু বলা হয়। এর গলনাংক ১৭০০ ডিগ্রি। এ ধাতু ইস্পাতের মত—অথচ অনেক হাল্‌কা। আগামী যুগে এরোপ্লেন ও জাহাজ নির্মাণে এ ধাতুর বহুল ব্যবহার প্রায় নিশ্চিত।

॥ বেলুন ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনদেশে সর্বপ্রথম বেলুন উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু চীনদেশে উদ্ভাবিত হলেও তা সেখানে বেশি উন্নতিলাভ করতে পারে নি। এরপর দীর্ঘদিন কেটে যায়। বেলুন আবিষ্কার সম্পর্কে কোন দেশই তেমন কিছু ভাবেনি।

অবশেষে, ফরাসীদেশের একজন কাগজ ব্যবসায়ীর দুই ছেলে জোসেফ ও জ্যাক সম্পূর্ণ খেয়ালবশতঃ কাগজের তৈরী বড় থলে তৈরী করে তার মধ্যে গরম ধোঁয়া পূর্ণ করে একদিন আকাশের দিকে ছেড়ে দিলো। আর সত্যি সত্যি গরম ধোঁয়ায় পূর্ণ থলেটা আকাশের দিকে উঠে গেলো। অবশ্য বেশি দূর উঠতে পারলো না। কিছুটা উপরে উঠে ধোঁয়া ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো। তা আসুক। তবু ওরা এর মধ্যে পেলো প্রচুর মজা এবং নেশা।

সেটা ইংরেজী ১৭৮২ সালের কথা। জোসেফ ও জ্যাক আরো বড় একটি কাগজের ফাঁপা বল তৈরী করলো। তারপর সেটিকে গরম ধোঁয়ায় পূর্ণ করে বাঁধন খুলে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বলটি আগের চেয়ে অনেক উপরে উঠে গেলো। আবার একই কারণে নিচে নেমে এলো। কিন্তু তাতে ওরা দ্বিগুণ উৎসাহিত বোধ করলো এবং এ ব্যাপারে আরো পরীক্ষা করার জন্যে অগ্রসর হলো।

১৭৮৩ সালের ৯ই জুন। ওই দিন জোসেফ ও জ্যাক জন-সমক্ষে তিনজন যাত্রীসহ একটি বিরাটাকারের বেলুনকে আকাশের দিকে ছেড়ে দিলো। ওই তিনজন যাত্রীর মধ্যে ছিলো একটি মেষ, মোরগ ও হাঁস। তাদের একটি ঝুড়ির মধ্যে রেখে সেই ঝুড়িটিকে বেলুনের নীচে বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো। শত শত নর-নারীর আনন্দ-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটি উপরের দিকে উঠতে লাগলো এবং দশ মিনিট বেলুনটি শূন্যে ভ্রমণ করে যাত্রীসমেত নিরাপদে নেমে এলো মাটির বুকে। এই ঘটনায় চারিদিকে বেলুন সম্বন্ধে বেশ সাড়া পড়ে গেলো এবং ফরাসীরাজ্যে মহা-উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো।

ফলে এরই কয়েক সপ্তাহ পরে 'পিলাতর দি রজিয়ে' নামক একজন সাহসী ফরাসী যুবক বেলুনে চড়ে একশো ফুট উপরে ভ্রমণ করে এলেন। অবশ্য তার বেলুনটি মাটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলো। কিছুদিন পর এই বীর সাহসী যুবকই তাঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আবার বেলুনযোগে আকাশে পাঁচশো ফুট ভ্রমণ করে এলেন। এবার কিন্তু বেলুনটি আবদ্ধ ছিলো না,—ছিলো মুক্ত।

১৭৮৪ সালে ইংলণ্ডে বিখ্যাত লুনাডি সর্বপ্রথম অক্সফোর্ড শহরে বেলুনে আরোহণ করেন।

১৭৯৪ সালে সর্বপ্রথম বেলুন যুদ্ধের সময় আবহাওয়া দেখার কার্যে ব্যবহৃত হয়।

শোনা যায়, ১৮১১ সালে যখন নেপোলিয়ানের পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন এক মহিলা বেলুনে আরোহণ করে ছোট ছোট ঘোষণা পত্র দ্বারা এই সুখবর চারিদিকে প্রচার করেন।

১৮১৬ সালে জার্মেনীর সামরিক বিভাগের জেপলিন নামক এক উচ্চ কর্মচারী ইহা দেখে খুবই মুগ্ধ হন। পরবর্তীকালে তিনিই এরোপ্লেনের উদ্ভাবন করেছিলেন। করেছিলেন জেপলিন।

কিন্তু এই বেলুনকে যিনি আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে আসেন তার নাম প্রফেসর চার্লস। চার্লস তখন ফরাসী সম্রাটের অতিথি হিসাবে প্রাসাদেই বাস করেন। মেঁাগোলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের বেলুন

আবিষ্কার ও সাফল্যের সঙ্গে যাত্রী সমেত তা আকাশে ওড়ানো, এসব বিজ্ঞানী চার্লসের নিকট বড়ই কৌতূহলের সৃষ্টি করলো। তিনি আর বসে রইলেন না, শুরু করলেন পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, ধোঁয়াভরা বেলুনের প্রধান অসুবিধা হলো— এই ধোঁয়াকে গরম রাখার জন্যে এর নিচে একটি আগুনের পাত্র বেঁধে দেওয়া। তাতেও বেলুন বেশী উপরে উঠতে পারেনা। কেমন করে এই অসুবিধা দূর করা যায়? ভাবতে, ভাবতে তিনি উপায় ও পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ, তিনি গরম ধোঁয়ার পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে বেলুন ওড়াবেন ঠিক করলেন। সে সময় বায়ু থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়ার কোন অসুবিটা নেই।

তৈরী করলেন ৩৫ ফুট গ্যাসের এক বেলুন। তাতে ভরলেন গ্যাস। এবার বেলুনটি ওড়ানোর পালা। কথাটা রটে গিয়ে ফেটে পড়লো চারদিক। কাতারে কাতারে লোক এসে জমায়েত হতে লাগলো যথাস্থানে. লোকে লোকারণ্য। হৈ, হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। এতবড় বেলুন আকাশে ওড়বে। সে কি লোকের কৌতূহল। সত্যি সত্যি বেলুনটি ওড়লো। ওড়লো হাজার হাজার জনতার সামনে। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো, একটি গোলাকার বস্তু চিরদিনের নিয়ম উপেক্ষা করে নিচের দিকে না নেমে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠছে। মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে চাঁদের দেশে পাড়ি জমানোর জন্যে বেলুনটি সোঁ সোঁ রবে উপরে উঠে যাচ্ছে। তারপর? তারপর একখণ্ড ঝড়ো মেঘের আড়ালে সেটা হারিয়ে গেলো। আর তাকে কেউ দেখলো না.

কিন্তু বেলুনটি তিন হাজার ফুট উপরে উঠে আবার নেমে এসেছিলো মাটির বুকে, তার পরের দিন। যে গ্রামে সেটা পড়েছিলো সে গ্রামের লোক সেটাকে বিরাটাকার কোন দৈত্য মনে করে তার উপর চালিয়েছিলো বেদম প্রহার। শুধু তাই নয় প্রহারে প্রহারে জর্জরিত বেলুনটিকে তারা খোঁজ নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলো চার্লসের নিকট।

যা হোক, এই প্রফেসর চার্লসই এর নাম-করণ করেন 'Ballon'। সেই নাম আজও প্রচলিত। তবে এখনকার বেলুন কাগজের পরিবর্তে পাতলা রবারের চাদর দিয়ে তৈরী করা হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাসও মাটির বুকে তৈরী করা যায়।

॥ নিষ্ক্রিয় গ্যাস ॥

প্রায় দু'শো বছর আগে ক্যাভেণ্ডিস নামে একজন বিজ্ঞানী গবেষণা করছিলেন, সব জায়গায় বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসের রূপ এক কিনা? কারণ তখন অবধি মানুষের ধারনা ছিলো, জলীয় বাষ্প (হাইড্রোজেন) ও অঙ্গার অম্লজান বাদ দিলে বায়ুমণ্ডলে মাত্র দু'টো গ্যাস আছে—যেমন, নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন। যা হোক, ক্যাভেণ্ডিস বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নাইট্রোজেনের সাথে অন্য একটি গ্যাসের সন্ধান পেলেন। কিন্তু তিনি এ নিয়ে আর গবেষণা করেন নি বা গবেষণা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

এরও প্রায় একশো বছর কেটে যাবার পর ইংরেজী ১৮৯৪ সালে লর্ড র‍্যালে নামে এক বিজ্ঞানী নানা রকম গ্যাসের ঘনত্ব (Density) নিরূপণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দেখলেন, রসায়নাগারে প্রস্তুত নাইট্রোজেন আর বায়ুমণ্ডল হতে পাওয়া নাইট্রোজেন এর ঘনত্ব এক নয়। বিশুদ্ধ রাসায়নিক নাইট্রোজেনের ঘনত্ব ১.২৫০৫ এবং বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের ঘনত্ব ১.২৫৭২। দশমিকের পর তৃতীয় স্থানের এই সামান্য তফাৎ অন্য লোকের দৃষ্টি হয়তো সহজেই এড়াতে পারতো। কিন্তু লর্ড র‍্যালের মত সুক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞানীর চোখে এই সামান্য তফাৎটা বড় করে দেখা দিলো। তিনি বার বার পরীক্ষা করে একই তফাৎ দেখতে পেলেন। তখন ক্যাভেণ্ডিসের গবেষণার কথা তার মনে হলো। ফলে তাঁর স্থির ধারনা হলো, বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের সঙ্গে অন্য একটি অনাবিষ্কৃত গ্যাস রয়েছে।

লর্ড র‍্যালের এই গবেষণার ফল দেখে, র‍্যামজে নামে আরো একজন বিজ্ঞানী এই অনাবিষ্কৃত গ্যাসটি আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলেন। বায়ুমণ্ডলের গ্যাস নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে র‍্যামজে এই নতুন গ্যাসটি পেলেন। পরে র‍্যামজে ও র‍্যালে এর প্রকৃতি পরীক্ষা করে দেখলেন : এই গ্যাস সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিশে যৌগিক পদার্থ তৈরী করে না। নতুন গ্যাসের এতটা নির্লিপ্ত ভাব দেখে র‍্যামজে এর নাম দিলেন— আর্গন (Argon) যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় 'অলস গ্যাস'।

'আর্গন গ্যাস' আবিষ্কৃত হবার পর চারিদিকে সাড়া পড়ে গেলো। সেই সঙ্গে র‍্যামজে এবং র‍্যালের নাম দেশ-বিদেশ ছড়িয়ে পড়লো। ফলে র‍্যামজের উৎসাহ বেড়ে গেলো। তাইতো তিনি বায়ু-মণ্ডলে আরো নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে কিনা তার খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি পেয়ে গেলেন আরো একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস— যার নাম দিলেন হিলিয়াম (Helium), বাংলা করলে দাঁড়ায় 'সৌরজ গ্যাস'। এটা সূর্যের মৌলিক পদার্থ হলেও র‍্যামজে 'ক্লেভাইট' নামক একপ্রকার খনিজ ধাতুকে 'সালফিউরিক অ্যাসিড' সহ উত্তপ্ত করে পৃথিবীতেই এই সৌরজ গ্যাস উৎপন্ন করতে সক্ষম হন।

সে সময় বায়ুকে তরল অবস্থায় পরিণত করে তাই নিয়ে গবেষণা চলছিলো। তরল বায়ু তখন বিজ্ঞানীদের নতুন জ্ঞানের ভাণ্ডার। র‍্যামজে এই তরল বায়ুকে বহু চেষ্টায় আংশিক বিভাজন করে তাতে আর্গন গ্যাস তো পেলেনই, উপরন্তু আরো নতুন গ্যাস পেলেন। তাদের নাম দিলেন 'ক্রিপটন' বা প্রচ্ছন্ন 'জেনন' বা অজ্ঞাত এবং 'নিয়ন বা নবীন গ্যাস'। এ ছাড়া পরে তেজস্ক্রিয় ধাতু থেকে আরো তিনটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার হয়েছে। যেমন, রেডন, থোরন ও একটিনন্।

এই নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কারের ফলেই আজ তোমরা বড় বড় সহরে সুসজ্জিত দোকানপাট, দেওয়ালের গায়ে প্রদর্শিত রং-বেরংয়ের আলোকসজ্জা দেখতে পাও।

॥ নিরাপদ কাচ ॥

বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারই অকস্মাৎ হয়েছে। তেমনি একটি আবিষ্কার 'সেফটি গ্লাস'—বাংলায় যাকে আমরা 'নিরাপদ কাচ' বলি। গল্পটা এই রকম :

ইংরেজী ১৯০৩ সালের কথা। রসায়ন-বিজ্ঞানী এডোয়ার্ড বেনিডিক টাস তাঁর গবেষণাগারে বসে একটি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালাচ্ছিলেন। সে সময় নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে তিনি এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা মানব সভ্যতার কল্যানসাধনে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করে নতুন কিছু আবিষ্কার করা। তাইতো তরুণ অধ্যাপক, রসায়ন-বিজ্ঞানী এডোয়ার্ড নিবিষ্টচিত্তে গবেষণা করছিলেন—একটি কাচের ফ্লাস্কে অ্যাসিটোন দ্রবণ ও সেলুলয়েড দ্রবণের মিশ্রণ নিয়ে। এই সময় হঠাৎ তাঁর অসাবধানতায় হাত ফসকে কাচের ফ্লাস্কটি মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো। তরুণ রসায়ন বিজ্ঞানী বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোগুলো চারিদিকে ছিটকে না গিয়ে গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। তিনি খুব সাবধানে ওই ভাঙ্গা ফ্লাস্কটি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সবিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন—এমনকি ঘটনার অস্বাভাবিকতায় ভুলে গেলেন কি বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করছিলেন। কাচ ভেঙ্গে গেলে তার টুকরোগুলো চারিদিকে ছিটকে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখে এডোয়ার্ড যেমন বিস্মিত হলেন তেমনি এর রহস্য উদ্ঘাটনের চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসলো।

এডোয়ার্ড আর দেরী করলেন না—সুরু করলেন পরীক্ষা। পরীক্ষা করে জানতে পারলেন ফ্লাস্কটির ভিতরের দিকে কাচের গায়ে সেলুলয়েডের একটা পাতলা ফিল্ম লেগে ছিলো—ওই ফিল্মই ভাঙ্গা কাচের টুকরোগুলো জড়িয়ে রেখেছিলো। এরপর তিনি আর এবিষয়ে অগ্রসর হননি।

তারপর কেটে গেছে কয়েক'মাস। একদিন তিনি সকালে খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে একটি খবর পড়ে বড়ই দুঃখ পেলেন। খবরটি ছিলো দুর্ঘটনার খবর, কয়েকটি শিশু ভাঙ্গা কাচের টুকরোর আঘাতে মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছে।

এ খবর পড়ে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অস্থির হয়ে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মাসাধিক কাল আগে গবেষণাগারের ওই ফ্লাস্ক ভাঙ্গার কথা তাঁর মনে পড়ে গেলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, যদি কাচের গায়ে সেলুলয়েড কিংবা ঐ জাতীয় কোন পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা এত ভয়াবহ হতো না। কাজেই তিনি আর সময়ের অপব্যবহার না করে, তখনই গবেষণাগারে গিয়ে সুরু করলেন গবেষণা। অচিরেই তার সুফল পেলেন এবং আবিষ্কার করলেন 'সেফটি গ্লাস' বা 'নিরাপদ কাচ'—যা আঘাতে ভেঙ্গে গেলেও কাচের টুকরোগুলো ছিটকে না গিয়ে গায়ে গায়ে লেগে থাকবে।

বর্তমানে তাঁরই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন ক'রে এ যুগের বহুল ব্যবহৃত 'ল্যামিনেটেড গ্লাস' নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। দু'খণ্ড কাচের পাতের মাঝখানে Plastic এর চাদর রেখে চাপ ও তাপ দিয়ে এই প্রকার কাচ তৈরী করা হয়।

॥ ইলেকট্রন টিউব ॥

এ যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কি—এ নিয়ে নিশ্চয়ই মতানৈক্য থাকতে পারে,—কিন্তু ইলেকট্রন টিউবের আবিষ্কার যে সবচেয়ে কার্যকরী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ এটির আবিষ্কার না হলে বেতার অনুষ্ঠান শোনা কিংবা সবাক চলচ্চিত্র দেখা সম্ভব হতো না। এই মূল্যবান বস্তুটি কেমন করে আবিষ্কার হলো --আজ তোমাদের সেই গল্পই সংক্ষেপে শোনাবো।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেতার-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিলো। এই সময় জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্ৎস বেতার-তরঙ্গের মৌলিক গুণাবলী আবিষ্কার করেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফরেষ্ট হার্ৎস তখন বেতার তরঙ্গের উপর পরীক্ষা করছিলেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন একটি যন্ত্র তৈরী ক'রে তার মধ্যে বেতার তরঙ্গ-এর উপস্থিতি ধরবেন। এ সম্বন্ধে এর আগেও কাজ হয়েছিলো।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্কণী কাচের টিউবে আল্‌গা করে লোহার গুঁড়া ভরে এ রকম একটি যন্ত্র বানিয়েছিলেন। কিন্তু ওইটি মোটেই স্পর্শকাতর ছিলো না।

এরপর ইংলণ্ডের জন এমব্রোজ ফ্লেমিং ইংরেজী ১৯০৪ সালে 'ইলেকট্রন টিউব' আবিষ্কার করেন। *এটি একটি বায়ুশূন্য টিউব*—যাতে দু'টি পদার্থ, ফিলামেণ্ট ও প্লেট ছিলো। ফিলামেণ্ট থেকে ইলেকট্রন প্লেটে প্রবাহিত হতো।

কিন্তু ফ্লেমিং-এর তৈরী টিউবটিও নিখুঁত হলো না। একটু ত্রুটি থেকেই গেলো। এর সাহায্যে সংকেতকে জোরদার করা যেতো না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী ফরেষ্ট চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ফ্লেমিং-এর তৈরী টিউবটি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন এবং টিউবটির

কিছু পরিবর্তন করে ওটিকে জোরদার করে তুললেন। ফরেষ্ট ফিলামেণ্ট ও প্লেট ছাড়া অপর একটি পদার্থ এতে জুড়ে দিলেন। এই নব সংযোজিত পদার্থের নাম 'গ্রিড'। এটি একটি জালের ঢাকনি—যার অবস্থান হলো ফিলামেণ্ট ও প্লেটের মাঝখানে। এই গ্রিডের কাজ হলো—ইলেকট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা। ইলেকট্রন টিউবে একটি বিশেষ দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় বলে—একে ভালভ ও বলে।

ফরেষ্টের তৈরী টিউবে তিনটি মৌল পদার্থ আছে—তাই এর নাম ট্রায়োড ভালভ। অনুরূপভাবে ফ্লেমিং-এর টিউবটি ডায়োড ভালভ। কিন্তু ফ্লেমিং-এর তৈরী ডায়োড ভালভই প্রেরিত সংকেত জোরদার করার কাজে যথেষ্ট কার্যকরী হলো।

বর্তমানে আমরা যে রেডিওসেট ব্যবহার করি—তাতে সংকেতকে ধরবার জন্যে 'ডায়োড' এবং একে শক্তিশালী করার জন্য 'ট্রায়োড ভালভ' ব্যবহার করা হয়—বুঝলে।

এখন তোমারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে—এটি একটি মূল্যবান আবিষ্কার এবং এর পিছনে ইংলণ্ডের ফ্লেমিং ও আমেরিকার ফরেষ্টের অবদান যথেষ্ট।

॥ পলিথিন ॥

পলিথিন—আধুনিক যুগে এই আশ্চর্য পদার্থটি যে কতশত রকমে ব্যবহার করা হচ্ছে, তোমরা তার সব খবর বোধহয় রাখো না। পলিথিনের তৈরী শক্ত ব্যাগের কথা কে না জানে! এই ব্যাগ সাধারণ কাজ থেকে আরম্ভ করে জলের প্রচণ্ড গতিকেও রোধ করতে সক্ষম; অর্থাৎ এই ব্যাগের মধ্যে বালি ভর্তি করে খরস্রোতা নদীতে বাঁধ তৈরী করে জলের প্রচণ্ড গতিও রোধ করা যায়।

পলিথিনের তৈরী এমন সব খাবার পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—যা মজবুত ও চিরস্থায়ী। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে এগুলি হাতুড়ি দিয়ে পিটলে, কঠিন জায়গায় আছাড় মারলে, বাঁকালে, গরম জলে কিংবা চরম শৈত্যের মধ্যে রেখে দিলেও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। তোমরাই বলো পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ আছে যা এতগুলি গুণের অধিকারী?

এছাড়া শাকসব্জি টাট্‌কা রাখতে আসবাবপত্রের উপর সৌখিন আবরণ রূপে পলিথিন আজকাল সকলের ঘরেই শোভা বর্দ্ধন করছে। আবার নানারকম ঔষধ প্রস্তুতকারক-সংস্থা ও রাসায়নিক প্রকল্পে উত্তপ্ত তরল পদার্থ পলিথিনের নল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

পলিথিন বিদ্যুৎ-অপরিবাহী বলে টেলিভিশন কেন্দ্রে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে ও সমুদ্রগামী জাহাজে ইনসুলেটররূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া তুষার পাতের হাত থেকে শস্য বাঁচিয়ে রাখা, উন্মুক্তস্থানে মেসিনপত্র রক্ষা করা, এবং তথ্যানুসন্ধানী বেলুনরূপে উর্দ্ধাকাশ থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পলিথিন সত্যি আশ্চর্য রকম কাজ করে।

পলিথিন প্রবেশ করেছে খেলনার রাজ্যেও। এ রাজ্যে পলিথিনেব আবির্ভাব দেরীতে ঘটলেও আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই আশ্চর্য পদার্থটি খেলনার রাজ্যেও আধিপত্য বিস্তার করবে। তখন শিশুরা খুশী মত খেলনাগুলিকে দুমড়ে, মুচড়ে, বাঁকিয়েও শায়েস্তা করতে পারবে না।

এবার শোন এই বহুগুণের অধিকারী আশ্চর্য পদার্থটি কেমন করে আবিষ্কার হলো সেই কাহিনী।

প্রায় সাইত্রিশ বছর আগের কথা। ইংল্যাণ্ডে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজের গবেষণাগারে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা তরল ইথিলিন ও পেট্রোলিয়ামের উপজাত মিশ্রিত করে এক নতুন ধরনের সিন্থেটিক পদার্থ উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে উচ্চচাপে এই দুই পদার্থের অণুগুলি সংযোজিত হবে এবং এক

নতুন ধরনের প্লাসটিক পাওয়া যাবে। কিন্তু মুসকিল হলো সেখানেই অর্থাৎ, এই দুই পদার্থ কিছুতেই মিলিত হলো না। একটি যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে রসায়নবিদেরা দেখলেন যে, অ্যালডিহাইড অপরিবর্তিত রয়েছে আর ইলিথিন সম্পূর্ণ এক নতুন পদার্থে পরিণিত হয়েছে। এই পদার্থটিই 'পলিথিন'।

॥ পাইরোসেরাম ॥

কাচের প্লেটের উপর ফটো তোলা যায় কিনা সে সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে আমেরিকার এক বিজ্ঞানী অভিনব এক বস্তু আবিষ্কার করেন—যা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ওই আলোড়ন সৃষ্টিকারী বস্তুটির নাম 'পাইরোসেরাম'। পাইরোসেরাম আবিষ্কারের গল্পটা এই রকম :

ইংরেজী ১৯৪৯ সাল। আমেরিকার এক গবেষণাগারে বিজ্ঞানী ডঃ ষ্টুকে কাচের প্লেটের উপর ফটো তোলা যায় কিনা সে সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। তখন তিনি গবেষণার কাজে ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন—এমন কি. কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার সময়ও তাঁর ছিলো না। এমনি ব্যস্ততার মধ্যেও ডঃ ষ্টুকে একদিন তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ীতে নেমতন্ন রক্ষা করতে গেলেন। না গেলে বন্ধু ও বন্ধু-স্ত্রী মনক্ষুণ্ণ হবে। তাই যাওয়া। নতুবা তিনি যেতেন না। কিন্তু এদিকে ঘটে গেলো এক অঘটন। যাওয়ার আগে তিনি কাচ তৈরীর যে সমস্ত উপাদান মিশ্রিত অবস্থায় ৬০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে তপ্ত করার জন্যে চুল্লীর উপর রেখে গিয়েছিলেন,—সেকথা তাঁর আর মনেই ছিলো না। সে রাত্রে ফিরতেও বেশ দেরী হয়ে গেলো ষ্টুকের। তাই তিনি আর গবেষণাগারে গেলেন না। বাসায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে যথারীতি তিনি গবেষণাগারে গেলেন। গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির। দেখলেন, ওই মিশ্র উপাদানগুলি সারা রাত্রি অতিরিক্ত উত্তাপে তপ্ত হয়ে কাচের মত একরকম স্বচ্ছ বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে আছে। ডঃ গুডইয়ার সেই সময় একটু উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁর সামান্য ভুলের জন্যে গেলো তো উপাদানগুলি নষ্ট হয়ে। মূল্যও তো কম নয়। উত্তেজনায় তখন তিনি রীতিমত কাঁপছিলেন। সেই অবস্থায় গুডইয়ার ওই রূপান্তরিত বস্তুটি হাতে নিয়ে দেখছিলেন, ওটা কি হলো! এমন সময় হঠাৎ ওই বস্তুটি হাত ফস্‌কে মেঝেতে পড়ে গেলো। ওই যাঃ গেলো বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে!

কিন্তু কি আশ্চর্য!, বস্তুটি খানিকটা লাফিয়ে উঠে আবার স্থির হয়ে রইলো। ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠলেন গুডইয়ার।

তিনি ওই বস্তুটিকে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে পুনরায় বহু উঁচু থেকে সজোরে নিক্ষেপ করলেন মেঝেতে। কিন্তু তিনি এবারো অবাক হয়ে দেখলেন—আকার-আয়তনে বস্তুটির এতটুকু ক্ষতি হলো না। বরং আগের মত লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে রইলো। এ দৃশ্য দেখে তিনি এক চরম পরীক্ষায় মেতে উঠলেন।

গুডইয়ার এই বস্তুটির উপর চালালেন ক্রমাগত হাতুড়ীর আঘাত। হাতুড়ীর আঘাতে নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন; কিন্তু বস্তুটির কোন রকম পরিবর্তন হলো না।

এ দৃশ্য দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অধীর আনন্দে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। কেননা, এমন যে কঠিন ধাতু ইস্‌পাত তাকেও আঘাত করলে তার দৈহিক পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখে গুডইয়ার ভাবলেন, নিশ্চয়ই এর ক্ষমতা ইস্‌পাতের চেয়েও বেশী।

ভুলে গেলেন কাচের প্লেটের উপর ফটো তোলার গবেষণার কথা। তিনি মেতে উঠলেন নতুন গবেষণায়—মেতে উঠলেন নতুন কিছু আবিষ্কারের আনন্দে। সারারাত্রি ব্যাপী কতটা উত্তাপে

উত্তপ্ত হয়ে ওই মিশ্রিত উপাদানগুলি ওই বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছিলো সেটা তিনি জানতেন না। জানবার কথাও নও। অথচ তাঁকে জানতে হবে। না জানলে ওর উৎপাদন সম্ভব নয়।

সুরু করলেন গবেষণা।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, চললো তাঁর গবেষণা। এ ভাবে গবেষণা ক'রে অবশেষে তিনি পেয়ে গেলেন উত্তাপের মাপটা। তারপর ওই বস্তুটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে তার নাম দিলেন—'পাইরোসেরাম'।

এমনি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার হলো নতুন এক অত্যাশ্চর্য বস্তু —যা লোহার চেয়ে কঠিন, এলুমিনিয়ামের চেয়ে হালকা, কাচের মত স্বচ্ছ, ইস্পাত গলানো তীব্র উত্তাপ যাকে গলাতে পারে না, অম্ল বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ করতে পারে না যার কোন ক্ষতি, প্রতি ১৬·৩৬ বর্গ সেন্টিমিটার এয়ার চাপ সহ্য করার ক্ষমতা ১৮·১৭৮ কিলোগ্রাম।

'পাইরোসেরাম' আবিষ্কারের পর ডঃ ষ্টুকের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। খবর পেয়ে আমেরিকার মহাকাশ ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা ছুটে এলো বিজ্ঞানী ষ্টুকের কাছে। এসে তাঁরা ষ্টুকের সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেললো।

উচ্চ চাপ ও তাপবাহী স্বচ্ছ জিনিষের অভাবে এদ্দিন যে শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি এই অত্যাশ্চর্য বস্তু 'পাইরোসেরাম' তাদের সে সম্ভাবনার পথ খুলে দিলো।

॥ কৃত্রিম রেশম ॥

প্রাকৃতিক নিয়মে রেশম পাওয়া যায় গুটিপোকা বা রেশম-কীট থেকে। তা বোধহয় তোমরা জানো। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই রেশম-কীট তো অপর্যাপ্ত নয়। অথচ রেশমী পোষাক পরিচ্ছদের কমনীয়তা শরীরের পক্ষে বেশ আরামদায়ক। ফলে এর চাহিদাও বেশি। আবার এর অগ্নিমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতারও বাইরে। বিজ্ঞানীরা এই সব অসুবিধার কথা চিন্তা করে গুটিপোকার উৎস ছাড়াই রেশম তৈরীর পরিকল্পনা করেন।

সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে এগিয়ে আসেন ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক। সেটা ইংরেজী ১৮৬৪ সালের কথা। তিনিই প্রথম সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেন যে, কৃত্রিম উপায়ে রেশম তৈরী করা সম্ভব। তারপর অনেক বছর ধরে এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে।

ইংরেজী ১৮৫৫ সালে সুইডিস রসায়নবিদ জর্জ য়ুডেমার্স সর্ব প্রথম কৃত্রিম রেশম তৈরীর পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। মালবেরি এবং অন্যান্য গাছের ছাল থেকে সংগৃহীত সেলুলোজ থেকে রেশমের তন্তু তৈরী করেন। এই তন্তু কিন্তু কাপড় বোনার মত যথেষ্ট শক্ত ছিলো না।

ইংরেজী ১৮৮৩ সালে ইংরেজ পদার্থ-বিজ্ঞানী স্যার জোসেফ W সোয়ান অপেক্ষাকৃত শক্ত কৃত্রিম রেশমতন্তু প্রস্তুতে সক্ষম হন। তবে প্রাকৃতিক রেশমের চেয়ে এই রেশমের দাম পড়েছিলো অনেক বেশি। সুতরাং এটাও কার্যকরী হলো না।

ইংরেজী ১৮৯০ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী কাউণ্ট হিলারী প্রথম কাপড় বোনার উপযোগী শক্ত কৃত্রিম রেশম তৈরী করেন। তিনি

প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের সহকর্মী ছিলেন। মালবেরি গাছের পাতা থেকে তিনি প্রথম সেলুলোজ সংগ্রহ করেছিলেন। পরে অবশ্য তুলা ইথারে ডুবিয়ে তার দ্রবণ তৈরী করে তা থেকে তিনি প্রয়োজনীয় সেলুলোজ সংগ্রহ করেছিলেন। কাউণ্ট হিলারীকেই কৃত্রিম রেশম-শিল্পের জনক বলা যেতে পারে।

এর পরই আমেরিকায় ১৯১১ সালে ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে কৃত্রিম রেশম তৈরী সুরু হয়। এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলো আমেরিকান ভিস্ কোজ কর্পোরেশন নামে এক বৃটিশ কোম্পানী।

কৃত্রিম রেশমকে রেয়নও বলা হয়। রেয়ন আসল রেশনের চেয়ে অনেক সস্তা এবং রেশনের সূতোর চেয়ে অনেক শক্ত। তাই রেয়নের জামা কাপড় বেশি ভারি। রেয়নের চেয়ে রেশম বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু রেয়ন রেশমের চেয়ে কম সহজদাহ্য। রেশম পোড়ালে চুল পোড়া গন্ধের মত গন্ধ নির্গত হয়—রেয়ন পোড়ালে সেরকম কোন গন্ধ পাওয়া যায় না।

বর্তমানে আমাদের দেশেও কৃত্রিম রেশম-শিল্প ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে চারটি রেয়ন কারখানা গড়ে উঠেছে।

॥ জীবাণু ॥

এণ্টনি লিউয়েন হোয়েক অনুবীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র আবিষ্কার করে জীবাণুলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন। কিন্তু এরা কোথায় থাকে, কি খায়, কিভাবে বড় হয়, দেখতে এদের কেমন, এরা মানুষের উপকার করে না অপকার করে, এদের হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি—তা তিনি বলে যেতে পারেননি।

এ সব প্রশ্নের যিনি সঠিক উত্তরে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম—লুই পাস্তুর।

হ্যাঁ, লুই পাস্তুরই সর্বপ্রথম বললেন : চিনির রস বেশীদিন ফেলে রাখলে যে গেঁজে যায়, বাসি দুধ যে টকে যায়, বাসি খাবার যে পঁচে যায়,—তার কারণ জীবাণু। সব জীবাণুর কাণ্ড। ওসব প্রকৃতির নিয়ম বা আপনা আপনি ঘটে না।

তিনি দীর্ঘদিন পরীক্ষা করে এ সত্য প্রমাণ ক'রে বললেন : বাতাসে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জীবাণু উড়ে বেড়াচ্ছে। সুযোগ পেলেই ওইসব জীবাণুরা যে কোন খাবারের মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে



লুই পাস্তুর

পুষ্টি সংগ্রহ ক'রে খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। ফলে পঁচে যায়। তিনি এই সব পঁচা খাবারের মধ্যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে পেলেন অসংখ্য জীবাণু। কিন্তু পচা জিনিসকে উত্তপ্ত করার পর দেখলেন—জীবাণু মরে গেছে। এছাড়া তিনি ভাল খাবারকে সাবধানে ঢেকে রেখে দেখলেন, দু'দিন থেকেও সে খাবার পঁচেনি। অবশ্য এমন ভাবে ঢেকে রেখেছিলেন যাতে বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো—রেশম পাওয়া যায় গুটিপোকা থেকে। ফরাসী দেশে তখন প্রচুর গুটিপোকার চাষ হতো। কিন্তু

হঠাৎ 'গুটিপোকার' মড়ক দেখা দিলো। রেশম শিল্পের দুর্দিন বুঝি ঘনিয়ে এল। চিন্তিত ফরাসী সরকার তাই ডেকে পাঠালেন পাস্তুরকে। এলেন তিনি। কয়েকটি গুটিপোকা পরীক্ষা করে বললেন, জীবাণু! এখানেও জীবাণুর প্রবেশ। তাদের মারার ব্যবস্থাও করলেন পাস্তুর। রেশম ব্যবসায়ীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

সেবার ফরাসী দেশে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যে খারাপ রোগ দেখা দিলো। হাজার হাজার প্রাণী মরতে লাগলো। আবার ডাক পড়লো পাস্তুরের। সেটা ৮৮১ সালের কথা। আবার এলেন পাস্তুর। তিনি গরু, ভেড়ার দেহ পরীক্ষা করে বললেন, এরা সব 'অ্যানথ্রাক্স' রোগে মরছে। এ রোগও একপ্রকার জীবাণু থেকে হয়। এ রোগের ও টিকা আবিষ্কার করে সে যাত্রা পাস্তুর গরু, ভেড়ার মড়ক রক্ষা করলেন।

পাগলা কুকুর, শেয়াল প্রভৃতি জানোয়ারে কামড়ালে একটা মারাত্মক রোগ হয়—রোগটার নাম জলাতঙ্ক। তখনকার দিনে এই জলাতঙ্ক রোগের কোন ঔষধ ছিলো না। তাই অনেক লোক মরতো। পাস্তুর এ সম্পর্কে গবেষণা করে একটি টিকা আবিষ্কার করলেন। টিকা আর কিছুই নয়—মৃত বা নিস্তেজ জীবাণু। এই জীবাণু শরীরে দিলে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ শক্তি জন্মায়। যা হোক, পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার করে প্রথমে তা কুকুর ও পরে মানুষের উপর প্রয়োগ করে যথেষ্ট সুফল পেলেন। এভাবেই তিনি আবিষ্কার করলেন জলাতঙ্ক রোগের মহৌষধ ও সন্ধান দিলেন জীবাণুর।

॥ ক্লোরোফর্ম ॥

আজকাল আর অস্ত্রোপচারের সময় শল্যচিকিৎসকদের খুব একটা বেগ পেতে হয়না—এমনকি যার ওপর অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় সে নিজেও টের পায় না। কিন্তু এমন একদিন ছিলো যখন মানুষের সজ্ঞান অবস্থায়ই ডাক্তাররা তাঁর উপর নির্দয়ের মত অস্ত্র প্রয়োগ করতেন। ফলে চিকিৎসকদের যেমনি বেগ পেতে হোত তেমনি রোগীর আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠত। মানুষের এই মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে যিনি অস্ত্রোপচার কার্য সহজ করে মানুষের অশেষ কল্যান সাধন করলেন,—সেই মানবদরদী, বেদনার বন্ধু, জন-হিতৈষী চিকিৎসকের নাম ডাঃ জেম্‌স ইয়ং সিম্পসন। এই সিম্পসনই ক্লোরোফর্ম বা চেতনানাশক দ্রব্যটি আবিষ্কার করেন। গল্পটি এই রকম :

সিম্পসন তখন সবেমাত্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাস করে বেরিয়েছেন। ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপক টমসনের প্রিয়পাত্র ছিলেন সিম্পসন। সুতরাং পাশ করে তাঁকে আর বসে থাকতে হলো না। অধ্যাপক টমসন ওঁকে ডেকে এনে সরকারী পদে বহাল করলেন। সুরু হল সিম্পসনের চাকরিজীবন—কর্মজীবন।

একদিন টমসন একটি কচি মেয়ের অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব নিয়ে সিম্পসনকে ডেকে পাঠালেন। সিম্পসন খবর পেয়ে ছুটে এলেন : আমায় ডেকেছেন স্যার। টমসন বললে : আমি আজ একটি মেয়ের ওপর অস্ত্র প্রয়োগ করবো। তুমি ওকে একটু ধরবে। এতে তোমার অভিজ্ঞতাও বাড়বে। সিম্পসন কোন আপত্তি করলো না।

যথাসময়ে যথারীতি মেয়েটির ওপর অস্ত্রোপচার আরম্ভ করলেন টমসন। আর সিম্পসন কচি মেয়েটিকে প্রাণপণ আকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে

রইলেন। ওঃ! সেকি মেয়েটির চীৎকার! তাঁর আর্ত চিৎকারে হাসপাতালের সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেলো—আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো। সিম্পসনের কোমল মনও বিগলিত হল। কিন্তু অধ্যাপক টমসন নির্দয়-পাষাণের মত নির্বিকারে অস্ত্রোপচার শেষ করলেন।

এদৃশ্য দেখার পর থেকে সিম্পসনের জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। এরপরই সিম্পসন স্নুরু করলেন গবেষণা। যেমন করেই হোক মানুষকে এই ব্যথা-বেদনা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হবে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি সে যুগের আবিষ্কৃত সমস্ত ঔষধ ও ইনজেকশন নিজের শরীরে প্রয়োগ করতে লাগলেন—এমনকি: রাসায়নিক পদার্থও চেখে দেখলেন। কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। পেলেন না চেতনানাশক কোন দ্রব্যের সন্ধান। তাই বলে তিনি হাল ছাড়লেন না—চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা সিম্পসন তাঁর দু'জন বন্ধুকে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। সারাদিনের ক্লান্তিটা দূর করার জন্যে ওঁরা তিন কাপ চা নিয়ে খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সিম্পসন দেখতে পেলেন তাঁর টেবিলের উপর নতুন ঔষধের একটি Sample file, হয়তো কোন Company সেটা পাঠিয়েছে। সিম্পসন ঔষধের শিশির ছিপিটা খুলে নাকের ভিতর প্রবেশ করালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা আমেজ অনুভব করলেন। তারপর শিশিটা এগিয়ে দিলেন বন্ধুদের কাছে। তাঁরাও ঘ্রাণ নিয়ে কেমন যেন একটা স্ফূর্তির নেশায় মেতে উঠলেন। বাঃ বেশতো! বলে সকলেই বার বার ঔষধের ঘ্রাণ নিতে লাগলো। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওঁরা তিনজন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। আধঘণ্টা পরে সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরলো সিম্পসনের—তারপর বন্ধুদের। সিম্পসন আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন: এদ্দিন আমি যা খুঁজেছি, তা পেয়েছি। এরপরই তিনি গবেষণা করে সেই শিশির ঔষধের বৈজ্ঞানিক পদার্থ আবিষ্কার করে এর গুনাগুন জগতে প্রচার করেন। এরই নাম ক্লোরোফর্ম।

॥ কুইনিন ॥

একসময় জ্বরের একমাত্র মহৌষধ ছিলো 'কুইনিন মিক্সার' বা টেবলেট। তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ ঔষধটি খেয়েছো। অসম্ভব রকম তেতো—মুখে দিলেই বমি আসতো। যেন নিমপাতাকেও হার মানায়। এখন অবশ্য জ্বরের আরো অনেক রকম ঔষধ আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এমন একদিন ছিলো যখন সাধারণ জ্বরেও অনেক মানুষ মারা যেতো। কারণ কি জানো? কারণ তখন এ রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোন ঔষধ সারা বিশ্বে জানা ছিলো না।

হয়তো প্রশ্ন করতে পারো—কে, কোথায়, কখন, কেমন করে এ ঔষধ আবিষ্কার করলো? সেই গল্পই সংক্ষেপে আজ তোমাদের শোনাবো।

ইংরেজী ১৬৪০ সালের কথা। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর বড়লাট ছিলেন তখন কাউন্ট অফ সিন্‌কেন। এই কাউণ্টেসের একবার ভীষণ জ্বর হলো। জ্বর আর ছাড়ে না—কেবল বাড়ে। সমস্ত লাটপ্রাসাদে যেন একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো। বড় বড় ডাক্তার, কবিরাজ, বদ্যি, সব এলো—আর চলে গেলো। কেউ বড়লাটের জ্বর ছাড়াতে পারলো না। তবে কি কাউণ্টেসকে বাঁচানো আর সম্ভব নয়! সবাই হতাস হয়ে পড়লেন।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন স্থানীয় এক ডাক্তার। তিনি এসে রোগীর জ্বর পরীক্ষা করলেন। জানলেন আর সব উপসর্গ। তারপর ফিরে এলেন। এসে একরকম বুনো উদ্ভিদের ছালের আরক তৈরী করে নিয়ে গিয়ে রোগীকে খাওয়ালেন। আর দু-একদিনের মধ্যেই কাউণ্টেসের জ্বর ছেড়ে গেলো। লাটপ্রাসাদের সকলের মুখেই হাসি দেখা গেলো!

এই বুনো উদ্ভিদের নাম হলো—সিন্‌কোনা। অবশ্য সিনকোনা নাম এর ছিলো না। এটা ছিলো তখনো নাম না জানা উদ্ভিদ। পরে কাউন্টেস্ অফ্ সিনকেনের নাম অনুসারে ওই বুনো উদ্ভিদের নাম হলো—সিন্‌কোনা। আজো সেই নামেই জগতের সর্বত্র পরিচিত।

এর আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। পরে সিনকোনার শুকনো ছাল থেকেই তৈরী হয়, 'কুইনিন'। আর সিনকোনা থেকে কুইনিন আবিষ্কার করেন দু'জন বিদেশী বিজ্ঞানী পেলটিয়ার ও ক্যাভেলটু ইংরেজী ১৮২০ সালে।

ইংরেজী ১৮৭০ সালে সিনকোনার বীজ ও চারা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে আনা হলো। তারপর ভারতের আবহাওয়া ও মাটি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা বললেন, একমাত্র দার্জিলিং জেলায়ই এর চাষ হতে পারে। বর্তমানে দার্জিলিং জেলার মংপুতে সিন্‌কোনার চাষ হচ্ছে—আগেও হতো।

সিনকোনা নানা জাতের। সবচেয়ে ভাল জাতের সিন্‌কোনার নাম—'সিন্‌কোনা সিকসিরুব্রা'। সিনকোনা 'কুইনিন' ছাড়াও অন্যান্য ঔষধ তৈরীতেও নাকি বর্তমানে ব্যবহার হচ্ছে।

॥ আয়োডিন ॥

আয়োডিনের নাম শোনে নি, এমন বোধহয় কমই লোক আছে। কারণ কাটা-ছেঁড়ায় এতদিন টিংচার আয়োডিনই ছিলো একমাত্র সেপ্‌টিক প্রতিষেধক। আজকাল অবশ্য অন্যান্য নানারকম ওষুধ বেরুবার ফলে সেপ্‌টিক প্রতিষেধক হিসাবে আয়োডিনের মুল্য অনেকটা কমে গেছে। তবে শরীরের একটা অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে আয়োডিনের প্রয়োজন কিন্তু অত্যাবশ্যকভাবে রয়ে গেছে। কেননা সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে গেলে প্রতিটি মানুষকেই কিছু পরিমাণ আয়োডিন ব্যবহার করতে হয়।

মানব শরীরে আয়োডিনের কাজ হলো, গলার সামনে যে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড আছে, সেখানে তৈরী করে থাইরয়েড হর্মোন নামে একপ্রকার রস। এই রস শরীরের প্রতিটি কোষের কার্যক্ষমতা রক্ষা করে।

শরীরে আয়োডিনের অভাব হলে থাইরয়েড হর্মোন-এর পরিমাণ কমে যায়। ফলে শরীরের কোষগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেখা দেয় গলগণ্ড রোগ। আয়োডিনের অভাবেই যে গলগুণ্ড রোগ হয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকজন মার্কিণ বিজ্ঞানী একথা প্রমাণ করেন —তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডেভিড মেরিন।

এখন প্রশ্ন করতে পারো—এই আয়োডিন আমরা কিভাবে গ্রহণ করি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—ছোট-বড়, মেয়ে-পুরুষ সকলেরই দৈনিক মাত্র এক মিলিগ্রামের দশভাগের এক ভাগ আয়োডিন প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন মেটাতে দোকান থেকে আয়োডিন কিনে খাবার কোন দরকার নেই। ফল-শাক-সব্জী ও গরু-মোষের দুধের মাধ্যমে এটা আমরা সংগ্রহ করে থাকি। সামুদ্রিক উদ্ভিদেও প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে। যার জন্যে জাপানের লোকদের গলগণ্ড রোগ হয় না—কারণ ওরা সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেতে ভালবাসে। এবার কেমন ক'রে এই অত্যাবশ্যক জিনিসটি আবিষ্কার হলো—সেই গল্প শোন।

ইংরেজী ১৮১১ সালের কথা। ফরাসী সম্রাট তখন নেপোলিয়ন। সেই সময় ফরাসী রসায়নবিদ্ বার্ণার্ড কোর্টিস সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে সোরা তৈরী করা যায় কিনা—তা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কারণ যুদ্ধের গোলা-বারুদ তৈরী করতে সোরা অপরিহার্য। কিন্তু বার্ণার্ড কোর্টিস বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও সাফল্যলাভ করতে পারলেন না। অর্থাৎ তিনি সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে সোরা তৈরী করতে পারলেন না। কিন্তু তার পরিবর্তে পেয়ে গেলেন আয়োডিন এবং তার সঙ্গে কোর্টিসের নাম অমর হয়ে রইলো রসায়ণের ইতিহাসে।

বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারই এমনি হঠাৎ হয়ে গেছে।

॥ স্যাকারিণ ॥

বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারই আকস্মিক ভাবে হয়েছে—তা হয়তো তোমরা জানো। কিন্তু স্যাকারিণও যে তেমনি একটি আবিষ্কার তা কি তোমরা জানো না! শোন, গল্প।

রসায়নবিদ ফালবার্গ 'জন হপকিন্স' বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলেন। গবেষণা করছিলেন আলকাতরা থেকে তৈরী কয়েকটি দ্রব্য নিয়ে। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে একটির নাম ছিলো 'টলুইন'। এটিও আলকাতরা থেকে তৈরী।

ফালবার্গ এই 'টলুইন' নিয়ে কি যেন একটা পরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু বার বার অকৃতকার্য হচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য সফল হচ্ছিলো না —অথচ পরিশ্রম হচ্ছিলো যথেষ্ট। তাই তো এক সময়ে তিনি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পরীক্ষা ছেড়ে উঠে গেলেন নিজের ঘরে। গিয়ে চাকরকে বললেন: এক কাপ চা তৈরী করে নিয়ে আয়।

চাকর আর দেরী করলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক কাপ চা' এনে রাখলো টেবিলের উপর। ক্লান্তি দূর করার জন্যে ফালবার্গ ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক থু-থু করতে লাগলেন। অস্বাভাবিক মিষ্টি! তেতো!

ভীষণ চটে গেলেন ফালবার্গ। চাকরকে বকতে লাগলেন: তোকে না কদ্দিন বলেছি, চায়ে বেশী মিষ্টি দিবি না!

—চাকর অবাক হয়ে বললে: মিষ্টি আমি বেশী দিইনি বাবু!

—ফের মিথ্যে কথা বলছিস। যা-আর এক কাপ চা' তৈরী করে নিয়ে আয়।

আরো এক কাপ চা এলো। এবারো তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে ওয়াক থু-থু করতে লাগলেন।

চাকর বেটার তো তখন আত্মারাম খাচাছাড়া। চাকরিটা বুঝি গেলো। কিন্তু না, ফালবার্গ ওকে কিছু না বলে খানিকক্ষণ কি

যেন চিন্তা করলেন। তারপর নিজের আঙুল চুষতে লাগলেন। হ্যাঁ—খুবই তো মিষ্টি লাগছে। তবে কি তাহলে···।

আর মুহূর্ত দেরী করলেন না। ছুটে গেলেন গবেষণাগারে। সেখানে গবেষণা-লব্ধ অনেক রাসায়নিক দ্রব্যই ছিলো। তিনি প্রত্যেকটির পৃথক পৃথকভাবে স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। একটিতে তিনি মিষ্টি স্বাদ পেলেন—আর আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলেন। আবিষ্কার হলো—স্যাকারিণ।

স্যাকারিণই পৃথিবীতে সবায় চেয়ে মিষ্টি। চিনির চেয়ে পাঁচশো পঞ্চাশগুণ মিষ্টি। তবে পরিমাণে বেশী হলে তেতো হয়ে যায়। ডাক্তাররা বহুমূত্র রোগীদের স্যাকারিণ খাওয়ার নির্দেশ দেন। তবে আজকাল চিনির অভাবে অনেক বাড়ীতেই চায়ের মধ্যে স্যাকারিণ ব্যবহার করেন।

॥ ইউরিয়া ষ্টিবামিন ॥

তোমরা নিশ্চয়ই কালাজ্বরের নাম শুনছো। কিন্তু এ রোগে বোধহয় কেউ ভোগনি। স্বাভাবিক। কেন না কালাজ্বর এখন আর তেমন দেখা যায় না—এমন কি, নেই বললেই চলে। কিন্তু এমন একদিন ছিলো, যখন এ রোগ বা জ্বর রীতিমত মানুষের আতঙ্কের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো—বিশেষ করে বাংলা, বিহার ও আসামের লোকদের মধ্যে। আর সে সময় এই সব দেশের কত শত লোক যে বিনা চিকিৎসায় এই জ্বরে প্রাণ হারিয়েছে তার কোন হিসেব নেই। এর কারণ কি জানো? কারণ তখনো এ রোগের কোন প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি।

কিন্তু তোমরা বোধহয় জানো, তখন কোন রোগ দেখা দিলেই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা সেই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন। এ ক্ষেত্রেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বসে রইলেন না,—সুরু করলেন গবেষণা। শুধু ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরাই নন, বিশ্বের

চিকিৎসাবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকরাও এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেন। চেষ্টা করতে লাগলেন কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও এর কোন মহৌষধ কেউ আবিষ্কার করতে পারলেন না।

এভাবে প্রায় দীর্ঘদিন কেটে গেল। অথচ কালাজ্বর তখন বাংলা, বিহার আসামের প্রতিটি ঘরে ঘরে। হাজার, হাজার শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এই জ্বরের কবলে পড়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে। সে এক অসহায় রূপ। চতুর্দিকে শুধু আর্ত্ত মানুষের ক্রন্দন রোল। ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতীয় তথা বাংলার এক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এগিয়ে এসে মানুষকে শোনালেন অভয় বাণী, আবিষ্কার করলেন কালাজ্বরেব প্রতিষেধক। তাঁর নাম উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

সে সময়ে তিনি কোলকাতার ক্যামবেল হাসপাতালে কাজ করতেন। একদিন তিনি হাসপাতালে কালাজ্বর বিভাগ পরিদর্শন করতে গিয়ে রোগীর যন্ত্রণা, কাতর আর্ত চিৎকারে অসহ্য হয়ে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই অসহায় মৃত্যুপথ যাত্রী রোগীদের কথা ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যথিত চিত্ত বিগলিত হলো। তাই তো তিনি আর দেরী করলেন না। সুরু করলেন গবেষণা। শুধু তাই না! উপেন্দ্রনাথ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন—যেমন করেই হোক তিনি কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কার কববেনই।

করলেনও তাই! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দিনরাত্রি গবেষণা করে অবশেষে তিনি একটি ঔষধ আবিষ্কার করলেন। ঔষধ তো আবিষ্কার হলো কিন্তু রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে কিনা সেই পরীক্ষা করা দরকার। শুরু করলেন পরীক্ষা। সেটা ইংরেজী ১৯১১ সালের কথা। তিনি ইউরিয়া দিয়া ষ্টিবামিন অ্যাসিডের যৌগিক তৈরী করে রোগীর দেহে ইন্‌জেকশন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার ফলও পেলেন। তখন তিনি ঐ প্রতিষেধকটির নাম দিলেন—'ইউরিয়া ষ্টিবামিন'। ফলে কালাজ্বরের করাল গ্রাস থেকে

মানুষ মুক্তি পেলো—বিজ্ঞানী হিসাবে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নামও দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

॥ পেনিসিলিন ॥

জীবাণুনাশক পেনিসিলিন চিকিৎসা জগতে এনেছে যুগান্তর। এর সাহায্যে অনায়াসেই আমরা এখন ফোড়া, ব্রণ, ঘা, রক্তদুষ্টি, টনসিল, প্রদাহ, নিউমোনিয়া ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকি। কিন্তু এমন দিন ছিলো যখন এই জীবাণু-প্রতিষেধক ঔষধটি আবিষ্কার হয়নি—তখন হাজার হাজার লোক সেপটিক হয়ে মারা যেত। এখন শোন কেমন করে আবিষ্কার হলো—'পেনিসিলিন' সেই গল্প।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং তখন লণ্ডনের চিকিৎসা জগতে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। সেই সময়ে একজন প্রতিভাশালী চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর সঙ্গে ফ্লেমিং-এর পরিচয় হলো। তাঁর নাম—রাইট। রাইট তখন টাইফয়েডের টিকা আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছেন। রাইটের প্রতিভা ফ্লেমিংকে আকৃষ্ট করলো। তাই তিনি আর দেরী করলেন না, রাইটের সহকারীরূপে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। শুধু তাই নয়—রাইটের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা জগতে নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলেন। শুরু করলেন গবেষণা।

প্রথমে তিনি নানারকম জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। জীবাণুগুলি একটি কাচের পাত্রে রেখে তাদের গতিবিধি, আচার-আচরণ, বংশবৃদ্ধি ও ধ্বংস ইত্যাদি বিষয়ের উপর গবেষণা করতে থাকেন। এভাবে প্রায় কয়েক বছর গবেষণার পরও তিনি তেমন কিছু সাফল্য লাভ করতে পারলেন না। তাই বলে তিনি হাল ছাড়ার পাত্র নন। বিখ্যাত তাকে হতেই হবে—যেমন করেই হোক।

একদিন তিনি দেখতে পেলেন তাঁর গবেষণাগারের কাচের পাত্রে রাখা জীবাণুগুলি সব মরে গেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন, ঐ পাত্রে একপ্রকার সাদা সাদা ছাতা গজিয়েছে। জীবাণুগুলি ছাতা গজাবার আগেও বেঁচে ছিলো। কিন্তু ছাতা গজানোর পরই জীবাণুগুলি মারা যাওয়ায় ফ্লেমিং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট হলো।

এরপরই তিনি মৃত জীবাণুগুলি ফেলে দিয়ে ঐ পাত্রে পুনরায় কিছু জীবন্ত জীবাণু রাখলেন কিন্তু কি আশ্চর্য! কয়েকদিন পর সে জীবাণুগুলিও মারা গেলো। আর স্থির থাকতে পারলেন না ফ্লেমিং—অস্থির হয়ে উঠলেন।

নব উদ্যমে শুরু করলেন গবেষণা। দিন-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ঐ ছাতা গজানোর জন্যেই জীবাণুগুলি মরে যাচ্ছে এবং ঐ ছাতাগুলোরও জীবাণু ধ্বংসের ক্ষমতা আছে।

তারপর ?

তারপর ইংরেজী ১৯১৯ সালে ইংরেজ জীবাণুবিদ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ঐ পাত্রে গজান সাদা ছাতা (চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম') বা নিম্নশ্রেণীর ছত্রাক দেহ থেকে আবিষ্কার করলেন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক— 'পেনিসিলিন'।

॥ ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন ॥

এমন একদিন ছিলো যখন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত রোগী তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নিতো। কেন না, তখন এ রোগের কোন প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার হয়নি। তবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বহু দিন থেকেই এ রোগের উপযুক্ত প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা করে আসছিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর—যুগের পর যুগ, এমনকি,—

হাজার বছর চেষ্টা করেও মানুষ এই ক্ষয়রোগের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়ের কোন প্রতিরোধ করতে পারে নি। অবশ্য হাল তাঁরা ছাড়েন নি, আর সেই জন্যেই কয়েক বছর আগে যক্ষ্মা রোগের অদ্ভুত একটি প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কারের ইতিহাসটা এই রকম :

ফিলাডেলফিয়ার কৃষি কলেজে পড়তেন জেকব ওয়াক্সম্যান। এখানে পড়ার সময় তাঁর মনে একটি প্রশ্ন জাগে। তিনি ভাবতে থাকেন, মৃত মানুষকে যখন মাটির নীচে কবর দেওয়া হয় তখন দেহের জীবাণুগুলোও নিশ্চয়ই মাটির নীচে চাপা পড়ে। কারণ সেগুলো তো মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসতে পারে না। তবে জীবাণুগুলো যায় কোথায়? কাজেই তাঁর ধারণা হলো, মাটিতে নিশ্চয়ই এমন কোন জীবাণু আছে,--যা ওই জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করতে পারে।

প্রশ্ন অবাস্তব নয়। কাজেই তিনি আর সময় নষ্ট করলেন না। কবরখানার মাটি নিয়ে সুরু করলেন গবেষণা। এবং অচিরেই গবেষণার ফল স্বরূপ কবরখানার মাটি থেকে আবিষ্কার করলেন এক ধরণের জীবাণুনাশক জীবাণু। যার নাম দিলেন তিনি 'ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন গ্রিসিয়ার্স'। সেটা ইংরেজীর ১৯১৫ সালের কথা।

এই আবিষ্কারের পরই ওয়াক্সম্যান রাটটার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। কিন্তু তিনি মাটির জীবাণুদের কথা ভুলতে পারলেন না। তাইতো নানারকম মাটি নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। সঙ্গে সহকারীরূপে নিলেন ফরাসী যুবক রেনি জুলে দোবেকে।

এবার দু'জনে মিলে পূর্ণ উদ্যমে গবেষণা সুরু করলেন। কবরখানার মাটি ছাড়াও অন্যান্য স্থানের মাটি নিয়ে গবেষণা করে, মাটির জীবাণু নিসৃত রস থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিষেধক আবিষ্কার করলেন—যার নাম দিলেন 'গ্রামিসাইডিন'। এই প্রতিষেধকটির বহু রোগ-জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা মানুষের উপর প্রয়োগ করা হলো না। কেন না এতে বিপদ দেখা দিতে পারে।

অবশেষে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একদিন ওয়াক্সম্যান মুরগির অন্ত্রের ভিতরে 'ষ্ট্রেপটোমাইসিন গ্রিসিয়ার্স' জীবাণুর সন্ধান পেলেন এবং এই জীবাণুনাশক জীবাণু নিঃসৃত রস থেকেই আবিষ্কার করলেন একটি শক্তিশালী প্রতিষেধক—যা যক্ষ্মা রোগ ছাড়াও, আমাশয়, টাইফয়েড ব্যাবিটফিবার, অ্যাডুলেণ্ট ফিবার প্রভৃতি রোগে বিশেষ কার্যকরী। আর এ জন্যেই ১৯৪৭ সালে ডঃ জেকব ওয়াক্সম্যান'কে দেওয়া হলো 'নোবেল পুরস্কার'—বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান।

॥ ইউরেনাস ॥

তোমরা ফ্রেডরিক উইলিয়াম হার্শেলের নাম শুনেছো কি? শোননি। সেকি! তোমরা ইউরেনাস আবিষ্কারকের নাম শোননি। শোননি সেই লোকটার কথা যিনি আকাশে কত তারকা আছে তার একটি তালিকা তৈরী করার জন্যে সর্বদাই দূরবীন চোখে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আরে হ্যাঁ, আমি সেই হার্শেলের কথাই বলছি।

হার্শেলের ইচ্ছে ছিলো তিনি মস্ত বড় একজন সঙ্গীতজ্ঞ হবেন। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি অল্প বয়সে সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিলেন। এমনকি, বাবার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রয়াল ব্যাণ্ড পার্টিতে। তারপর কি ভাবে সঙ্গীতচর্চ্চা ছেড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হলেন—শোন সেই গল্প।

সঙ্গীতজ্ঞ হলেও ছোটবেলা থেকেই হার্শেল রাতের বেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতেন—এই যে আকাশ ভর্তি তারাগুলি ফুটে রয়েছে এর সংখ্যা কি নির্ণয় করা যায় না? পাগল, তাই কখনো হয়। বলতেন বাবা, মা। কিন্তু কে কার কথা শোনে। পাগল বলতেই যেন তাঁর জিদ আরো বেড়ে গেলো। দেখাই যাক না চেষ্টা

হরে। বলে তিনি একটি দূরবীন জোগাড় করে তারা গুনতে আরম্ভ করলেন।

আকাশ ভর্তি তারা ফুটেছে। আর সেই দিকে একটি দূরবীণে চোখ লাগিয়ে তাকিয়ে আছেন হার্শেল। এমনি একদিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তারা গুনতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন একটি জ্যোতিষ্ককে। সে রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার! তিনি দেখলেন, সেই জ্যোতিষ্কটি নড়ছে! তা' হলে তো ওটা নক্ষত্র নয়! মন তাঁর আশায় দুলছে। নিশ্চয়ই ওটা একটা ধূমকেতু। হ্যাঁ, এতে আর কোন সন্দেহ নেই, ওটা ধূমকেতু—উদ্ভাসিত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন হার্শেল। আর কিছু না হোক, তিনি একটা ধূমকেতুর আবিষ্কারের খ্যাতি তো পাবেন!

অচিরেই হার্শেলের ভুল ধরা পড়লো। গ্রীনউইচ, অক্সফোর্ড এবং অন্যান্য স্থানের জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে জ্যোতিষ্কটির কক্ষপথ নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর সেখানেই অসুবিধা দেখা দিলো। ধূমকেতুর যে অধিবৃত্তাকার পথে জ্যোতিষ্কটির চলবার কথা জ্যোতিষ্কটিতো সে পথে চলছে না। তাহলে?

সত্যি তো—হার্শেল পড়লেন দ্বিধায়! এতদিন ধরে তিনি যাকে ধূমকেতু বলে ধরে নিয়েছিলেন—সেটাতো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ধূমকেতু নয়! তাহলে জিনিষটি কি?

অবশেষে, প্রখ্যাত গাণিতজ্ঞ যোহান লেলিল জ্যোতিষ্কটিকে ভাল করে লক্ষ্য করে বললেন,—এটি ধূমকেতু নয়, পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরের কোন গ্রহ। এ ভাবেই সমস্যার সমাধান মিললো। আবিষ্কার হলো একটি নতুন গ্রহ।

অথচ তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে,—এই গ্রহটিকে ফ্লেমষ্টিড, ব্রাডলে প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১৬৯০ থেকে ১৭৮১ সাল পর্যন্ত কম করে ও সতেরো বার লক্ষ্য করেছেন—আর প্রতিবারই তাঁরা এটিকে নক্ষত্র ভেবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন নি। এটা স্বীকার করতেই হবে, তাঁরা হার্শেলের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেননি, কি বলো?

থাক, এবার তো একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার হলো এবং দেশ-বিদেশে হার্শেলের নাম ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু গ্রহটির একটি নতুন নামকরণ তো করা দরকার। তৃতীয় জর্জের সম্মানে হার্শেল গ্রহটির নাম দিলেন—জর্জিয়ান সাইডাস্। কিন্তু এই নাম বেশিদিন কেউ গ্রহণ করলো না। ফরাসী বিজ্ঞানী লালাডে এর নাম দিলেন 'হার্শেল'। তাও টিকলো না। শেষে, বার্লিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী-বোর্ড এর নাম দিলেন—'ইউরেনাস'। এই নামটিই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেলো।

ইউরেনাস নিঃসঙ্গ নয়। আরো পাঁচটি সঙ্গী তার আছে। যেমন এরিয়েল, অ্যামব্রিয়েল, টাইটানিয়া, অবেরন ও মিরাণ্ডা। এই উপগ্রহগুলি চারদিকে অবিরাম ঘুড়ে বেড়াচ্ছে।

এভাবে ইউরেনাস আবিষ্কার করে 'হার্শেলই শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানী দলে খ্যাতিলাভ করেননি,—আরো নতুন গ্রহ নেপচুন এবং প্লুটো আবিষ্কারের পথও সুগম করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

॥ নেপচুন ॥

সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ নেপচুন আবিষ্কারের কাহিনীটা অনেকটা এই রকম : ইউরেনাস আবিষ্কৃত হবার পর বিজ্ঞানীরা তার কক্ষ এবং গতি প্রকৃতি অঙ্ক কষে বার করলেন। কিন্তু মুসকিল হলো কোথায় জানো—গণিতের সাহায্যে যে গতি বেরুলো, আকাশে দৃষ্ট ইউরেনাসের গতির সঙ্গে তার কিছু অমিল হতে লাগলো। অবশ্য খুবই সামান্য। এমন কি খালি চোখেও তা ধরা সম্ভব না। তা বললে তো হবে না—গরমিল যখন হচ্ছে তখন এর রহস্য উদঘাটন করতেই হবে। দেখতে হবে কেন এই রকমটি হচ্ছে। নিশ্চয়ই এর কোন কারণ আছে—হয়তো বা কোন অজ্ঞাত গ্রহের আকর্ষণেই ইউরেনাসের গতির এরূপ গরমিল হচ্ছে?

এই ধারনা পোষণ করেই ইংরেজ বিজ্ঞানী অ্যাডাম্‌স এবং ফরাসী বিজ্ঞানী লেভোরিয়ো অজ্ঞাত গ্রহটির ওজন কিরূপ হওয়া উচিত এবং সেটি আকাশের কোথায় থাকলে ইউরেনাসের গতিতে উপরোক্ত গরমিল হওয়া সম্ভব তা নিয়ে দু'জনেই অঙ্ক কষতে বসলেন। অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। অচিরেই তাঁরা তাঁদের গণনা কার্য শেষ করলেন। তবে লেভোরিয়োর গণনা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই অ্যাডাম্‌স এর গণনা শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডামস তাঁর গণনার ফলাফল জানিয়ে ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী চ্যালিসকে এই অজ্ঞাত গ্রহটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু চ্যালিস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দ্রুত এগোতে পারলেন না। কেননা তখন ইংলণ্ডে নক্ষত্র মণ্ডলের ভালো নক্‌শা ছিলো না। অথচ নকশা ছাড়া এটা লক্ষ্য করা মোটেই সম্ভব না যে, কোন জ্যোতিষ্ক স্থানচ্যুত হলো কিনা অথবা নতুন কোন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হলো কিনা— তাহলে সেটিই অজ্ঞাত গ্রহের সন্ধান দেবে। কিন্তু অসুবিধার কথা চিন্তা করে চ্যালিস কেম্ব্রিজের নক্‌শা প্রস্তুত করতে লাগলেন। বেশ কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ কাজ। কাজেই বুঝতে পারছো এ কাজে তাঁর বেশ দেরী হতো লাগলো।

এদিকে লেভেরিয়ে গণনা শেষ করে এই অজ্ঞাত গ্রহটির অনুসন্ধান করবার জন্যে বার্লিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী গালে'কে অনুরোধ জানান। বার্লিন মানমন্দিরে নক্ষত্রমণ্ডলের নিখুঁত নক্‌শা ছিলো। কাজেই গালে আর মুহূর্ত দেরী করলেন না—সেই রাত্রে অজ্ঞাত গ্রহটির অনুসন্ধানে লেগে গেলেন এবং দূরবীণের সাহায্যে লেভেরিয়ের নির্দেশিত নক্ষত্রমণ্ডলে সত্যি সত্যি নক্ষত্রের চেয়ে খানিকটা বড় আলোর চাকতির মত দেখতে পেলেন। এটাই যে সে অনাবিষ্কৃত গ্রহ বা ইউরেনাসকে আকর্ষণ করছে, তাতে আর গালের কোন সন্দেহ রইলো না। গ্রহটি মহাকাশের গহিন আঁধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে রোমক সমুদ্র দেবতার নাম অনুসারে এর নামকরণ হলো 'নেপচুন' (Neptune)। সেটা ১৮৪৬ সালের কথা।

এ খবর শুনে বিজ্ঞানী চ্যালিস খুবই ব্যথিত হলেন। ব্যথিত হলেন অ্যাডাম্‌সও। কেননা একটা আশা নিয়ে তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে এই গণনাকার্যে একান্ত পরিশ্রম করেছেন—আর তার শেষ পরিণতি যে এমন হবে তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। না পারাই স্বাভাবিক, কারণ তার কাজে তো কোন ত্রুটি ছিলো না।

এক্ষেত্রে চ্যালিসেরও একটু ত্রুটি হয়েছিলো। সে কথা তিনি পরে বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন যে—তার কাজে আরো একটু মনোযোগী এবং সতর্ক হ'লে অনুসন্ধানের কাজে মনোনিবেশ করার চতুর্থ দিনেই তিনি এই অজ্ঞাত গ্রহটি আবিষ্কার করতে পারতেন। এ জন্যে হয়তো তাঁকে সারাজীবন অনুতাপ করতে হয়েছে।

তবে আশার কথা এই যে—বিজ্ঞান জগতে খানিকটা সততা এখনো আছে তাই 'নেপচুন' সম্পর্কে ভবিষ্যত-বাণী করার কৃতিত্ব এখন অ্যাডাম্‌স এবং লেভোরিয়েকে সমভাবেই দেওয়া হয়।

নেপচুন সূর্য থেকে ২৭৯ কোটি মাইল দূরে। অন্যান্য গ্রহের মত নেপচুন ও সূর্যের চারিদিকে ঘোরে—কিন্তু খুব আস্তে, সেকেণ্ডে মাত্র তিন পূর্ণ দু'য়ের পাঁচ মাইল। আর সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে সময় নেয় ১৬৪ বছর ৬ মাস। এর ব্যাস ইউরেনাসের মতই বরং সামান্য হাল্‌কা এবং জলের চেয়ে সামান্য ভারী। নেপচুনের ব্যাস প্রায় ৩২,৯০০ মাইল—পৃথিবীর প্রায় চারগুণ। এর দিনগুলি বোধ হয় কিছু ছোট। নেপচুনের একটি মাত্র চাঁদ—'ত্রিতন' যাকে সহজে দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকদের ধারনা, নেপচুনের আরো একটি চাঁদ আছে।

নেপচুনকে কি ভাল করে দেখা যায় না?—ঠিক তাই। আমরা পৃথিবীর বুকে শুক্রকে যতটা ছোট দেখি নেপচুন থেকে সূর্যকে বোধ হয় তত ছোটই দেখায়। আর সেই সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত নেপচুনের কতটুকুই বা আমরা দেখতে পাই। তাই বিজ্ঞান এই দূরের গ্রহটি সম্পর্কে খুব কমই জানে।

॥ প্লুটো ॥

সৌরজগতের নবম গ্রহ হলো প্লুটো। শুধু মাত্র গাণিতের হিসাবের উপর নির্ভর করে যেমন 'নেপচুন' আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিলো ঠিক সেই উপায়েই আবিষ্কৃত হয়েছিলো 'প্লুটো'। কাহিনীটা এই রকম :

সেটা ইংরেজী ১৯০৫ সালের কথা। উত্তর আমেরিকার ফ্ল্যাগষ্টাফ মান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পার্সিভ্যাল লাওয়েল হিসেব করে দেখলেন যে, তখনকার আবিষ্কৃত সবগুলি গ্রহের আকর্ষণ হিসেব করেও ইউরেনাসের গতির ব্যতিক্রম ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না। নেপচুনের বাইরের অন্য কোন গ্রহ থাকলে তবেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাই পার্সিভ্যাল লাওয়েল নেপচুনের সীমা ছাড়িয়ে আরো কোন গ্রহ থাকা সম্ভব কিনা তা নির্ধারণ করতে উৎসাহী হলেন। শুধু তাই নয়—তিনি সুদীর্ঘ নয় বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯১৪ সালে তাঁর গণনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি নির্মম পরিহাস যে, যশোলক্ষ্মী তাঁর ঘরের দুয়ারে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। অর্থাৎ লাওয়েল যে অনুসন্ধান কার্য সুরু করেছিলেন তা সাফল্যমণ্ডিত হবার আগেই ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যু হলো। কিন্তু তাঁর সহকারীরা এই দুরূহ অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। দুঃখের বিষয় দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করেও তেমন কোন সাফল্য ওঁরা অর্জন করতে পারলেন না। অবশ্য তেমন কোন শক্তিশালী দূরবীণও তখন লাওয়েল মানমন্দিরে ছিলো না।

কাজের সুবিধার জন্যে প্রায় চব্বিশ বছর পরে—১৯২৯ সালে, একটি ১৩ ইঞ্চি ব্যাসের নতুন দূরবীণ মানমন্দিরে বসানো হলো এবং তরুণ গবেষক 'টমবাউ'-এর উপর অজ্ঞাত গ্রহটির অনুসন্ধানের ভার পড়লো।

টমবাউ আকাশের সম্ভাব্য অঞ্চলগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নতুন দূরবীণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে এক বছরের মধ্যেই ১৯৩০ সালের ১৩ই মার্চ লাওয়েল মানমন্দির থেকে এই গ্রহটির আবিষ্কারের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হলো। অচিরেই সব দেশের বিজ্ঞানীরা একে নব আবিষ্কৃত গ্রহ বলে স্বীকার করে নিলেন।

এবার গ্রহটির নাম করণের পালা। গ্রহটি সৌরজগতের শেষ সীমায় তমসাবৃত অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই গ্রীক পুরাণে বর্ণিত অন্ধকার পাতাল-পুরীর দেবতা প্লুটোর নাম অনুসারে এর নামকরণ হলো। এই নামকরণের সার্থকতা সবদিক দিয়েই সমান। প্লুটো নামের প্রথম দুই অক্ষর পি এবং এল আর যে বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লাওয়েল এই গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন, তার নামের আদ্য অক্ষর ও পি এবং এল।

প্লুটোর দূরত্ব সূর্য থেকে ৩৫০ কোটি মাইল। ৪,০০০ হাজার মাইল এর ব্যাস। কিন্তু এর ঘনত্ব পৃথিবীর ৯ ভাগের ১ ভাগ। প্লুটো ২৬০ বছরে একবার করে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। প্লুটো এবং নেপচুন—যে পথ দিয়ে তারা সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, দুটি বিন্দুতে তারা এক হয়ে গেছে- তাই ১৮৯৫ সালে ওরা দু'জন এসে গিয়েছিলো খুবই কাছাকাছি। সূর্যের প্রথম সন্তান প্লুটো হলেও বিজ্ঞান তাকে আবিষ্কার করলো পৃথিবীর সর্বশেষে—হয়তো তার পরে আর নেই।